মূর্ছনা

অষ্টম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা

শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়

লিচুবাগান, আগরতলা

শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের
সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান
১৫, ১৬ ও ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
মুক্তধারা লেকপুর

শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী
সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় আয়োজিত

RASHTRIYA EKTA DIWAS

SACHIN DEBBARMAN MEMORIAL
GOVERNMENT MUSIC COLLEGE
ALUMNI
LICHUBAGAN • AGARTALA
ESTD.-2013-14

HAPPY
TEACHER'S
Remedial Coaching Class

মূর্ছনা

অষ্টম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা

শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়

লিচুবাগান, আগরতলা

মূর্ছনা-২০১৭

সঙ্গীত শিল্প সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা

অষ্টম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা

SDBM Govt. Music College, September-2017

Murchana - 2017

A House Magazine on Music, Art & Culture

Published by the Principal on behalf of Sachin Debbarman Memorial Govt. Music college, Lichubagan, Agartala
Pin. 799010, Tripura

Editors
Sri Mrinal Roy
Smt Kalpana Dey

প্রচ্ছদের ছবি ঃ যোগেশ বামনি, হায়দ্রাবাদ
প্রচ্ছদ ঃ সুশান্ত শংকর হাজরা

মুদ্রণ ও অলংকরণ ঃ কালার্স, আগরতলা, ফোন— ০৩৮১-২৩১ ৮৯৬৭

অধ্যক্ষার কলমে...

ভারতীয় শাস্ত্রে সঙ্গীতকে বলা হয়েছে ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মশব্দের অর্থ আনন্দ। সঙ্গীত মানুষকে আনন্দ দান করে মানুষের মনকে পবিত্র ও নির্মল-কোমল করে। সঙ্গীত বিজ্ঞানীগণ বলেছেন যে প্রকাশলীলায় সব শিল্পের মধ্যে সঙ্গীতই সূক্ষ্মতম। এর মাধ্যম সুর। এটি রূপকে প্রকাশ করে না, রূপের যে গতিশীল ব্যঞ্জনা তাকেই প্রকাশ করে। সঙ্গীতের সুর মানবাত্মার এক অসংজ্ঞায়িত সৌন্দর্যাবেগের ধ্বনিময় প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ বলেছে সমস্ত সঙ্গীত ঈশ্বরেরই অঙ্গ, সঙ্গীতে ঈশ্বর ধ্বনিময় রূপ পরিগ্রহ করেন। পাশ্চাত্য দর্শনেও সঙ্গীত অধ্যাত্মচিন্তার সঙ্গে যুক্ত। যে প্লোটো শিল্পীদের নির্বাসন দিতে চেয়েছিলেন তাঁর Rebulic থেকে তিনিও তাঁর Timeaeus গ্রন্থে বলেছেন যে, সঙ্গীতকে মানুষ আমোদ আহ্লাদের জন্য ব্যবহার করছে বটে, কিন্তু ঈশ্বর সঙ্গীতের সুর সৃষ্টি করেছেন মূলত মানবাত্মার অসংযত আবেগসমূহকে সংযত করার উদ্দেশ্যে। ছন্দ বা তাল সৃষ্টির উদ্দেশ্যও তাই। আমাদের অপরিমিত অনিয়মিত এবং ছন্নছাড়া মনোবৃত্তিসমূহকে সুশৃঙ্খল করার জন্যে।

এহেন অনির্বাচনীয় সঙ্গীতের সেবায় কায়মনোবাক্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে কাজ করে চলেছে শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উন্নতি, প্রচার-প্রসারের মতো একটা সুপরিকল্পিত মহান কাজকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন এখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকামন্ডলী। এখনকার ছাত্র-ছাত্রীরা সংস্কৃতির সামিয়ানাতলে সুসংস্কৃত ও দায়িত্ববান নাগরিক হয়ে ওঠতে পারে— এই লক্ষ্যে মহাবিদ্যালয় সদাসতর্ক।

পরিশেষে মূর্ছনার এই সংখ্যা রূপায়নে যারা ব্রতী হয়েছেন এবং যারা নিজেদের মূল্যবান লেখা দিয়ে পত্রিকাটির মান বাড়িয়েছেন তাদের সকলকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা ও মূর্ছনার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শুভেচ্ছান্তে —

ড. মণিকা দাস
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা
শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়
লিচুবাগান, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

ত্রিপুরার আকাশে বাতাসে বসন্তের আগমন বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে। অশোক পলাশ শিমূল কৃষ্ণচূড়ার রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে আকাশ। এ যেন কবির ভাষায় 'নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগলো'। নানা ফুলে বিকশিত, মধুগন্ধে আমোদিত কোকিলের কুহুতানে মুখরিত এই বসন্তে শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের মুখপত্র 'মূর্ছনা' প্রকাশিত হলো। এই মুখপত্র প্রকাশে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করার জন্য লেখক, প্রকাশক, উপদেষ্টা মন্ডলী-সকলকে জানাই সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ। এঁরা সব সময় আমাদের পাশে থাকবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি "জানি বন্ধু জানি তোমার আছে তো হাতখানি"। সকল পাঠককে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। তাঁদের জন্যই এই মুখপত্র প্রকাশের শুভ প্রয়াস আমরা চালিয়ে যাব।

সঙ্গীত সম্পর্কে চিন্তাশীল ভাবনা, জীবনবোধের প্রকাশ, গীত বাদ্য নৃত্যের সৃজনশীল আলোচনা, নন্দনতত্ত্ব সাহিত্য চর্চা ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোকপাত করাই 'মূর্ছনা'র উদ্দেশ্য। রুচিশীল সংস্কৃতি ও মননশীল সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস 'মূর্ছনা' চিরকাল চলিয়ে যাবে। এই চলার পথে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের পাথেয় এবং কাম্য। সকলের সহযোগিতা ও আর্শীবাদধন্য হয়ে 'মূর্ছনা' নব সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠুক, এগিয়ে চলুক লক্ষ্যের দিকে—

অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দ লোক করি বিরচন
গীত রসধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলিজালে।

ধন্যবাদ সহ
কল্পনা দে
মৃণাল রায়।

সূচীপত্র

১. নৃত্যের নবজন্ম—রবীন্দ্রনাথ ও শান্তি নিকেতন—কল্পনা দে # ৭

২. ত্রিপুরার সঙ্গীতচর্চার সেকাল ও একাল— ড. মণিকা দাস # ১২

৩. ত্রিপুরার উপজাতিদের বাদ্যযন্ত্র — মৃণাল রায় # ৪০

৪. তুমি রবে নীরবে (নৃত্য শিল্পী ৺রমা চক্রবর্তী স্মরণে)— সংহিতা ঘোষ # ৪৩

৫. রবিঠাকুরের গানে রাগ সঙ্গীতের প্রভাব— অর্জুন চক্রবর্তী # ৪৫

৬. CULTURAL CRITICISM: AN ANALYSIS OF MEDIA REPORTING IN THE CONTEXT OF INDIAN CLASSICAL MUSIC- DR. TRIPTI WATWE # 54

৭. RABINDRANATH TAGORE AND THE CULTURES OF THE EAST AND THE WEST - A MUSICAL PERSPECTIVE- SHOUNAK RAY # 60

৮. THE IMPACT OF SANKARDEVA AND HIS SATTRAS ON THE SOCIAL LIFE OF ASSAMESE PEOPLE- SMITA LAHKAR # 66

৯. INDIAN CULTURE- SHREYASHI DAS # 74

১০. FACULTY AND OTHER STAFF OF SACHIN DEBBARMAN MEMORIAL GOVT. MUSIC COLLEGE # 78

সূচনা

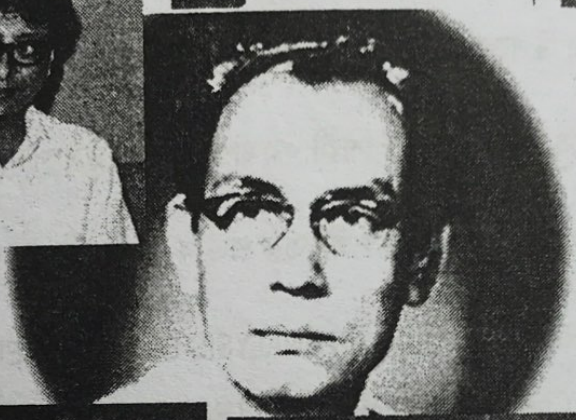

শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়

লিচুবাগান, আগরতলা

নৃত্যের নবজন্ম

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তি নিকেতন

কল্পনা দে

নৃত্যের উৎপত্তির মূলে রয়েছে ধর্মীয় ভাবনা, আধ্যাত্মিকতা, প্রাচীন যুগ পেরিয়ে মধ্যযুগে এসে নৃত্যে অবক্ষয় শুরু হল। অষ্টাদশ শতকে মুসলমান শাসনে মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত নৃত্যগুলি আশ্রয় নিল নবাবের দরবারে। ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় পাশ্চাত্য প্রভাবে ভক্তিরসের নৃত্য ও শাস্ত্রীয় নৃত্যে মিশ্রিত হয় রাজদরবারে মনোরঞ্জনের জন্য চমকপ্রদ চটুলতা। নব্য শিক্ষিত বাবু সম্প্রদায়ের দেহ মনের পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে আমদানী হল বাইনাচ। তৎকালীন সময়ে ঠাকুর পরিবার শিক্ষা দীক্ষা ভাবনা চিন্তায় সমসাময়িকদের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন— এই পরিবারেই উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পঙ্কে নিমজ্জিত নৃত্যকে তুলে এনে স্বর্গীয় সুষমা দান করলেন— নবজন্ম হল নৃত্যের।

শান্তি নিকেতনে এই নৃত্যের বীজ ধীরে ধীরে ডানা মেলতে থাকে কিন্তু শান্তি নিকেতনে এই নৃত্যের বীজ বপনে বিশেষ করে সে যুগে মেয়েদের মধ্যে নাচের প্রচলন ঘটাতে তাঁকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রচুর সমালোচনা নিন্দার আঘাত সইতে হয়েছে। আমরা একটি সমস্যার ঘটনা উল্লেখ করতে পারি— শান্তি নিকেতনে মেয়েরা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' মঞ্চস্থ করবে ঠিক হল। কবির কাছে মহড়া শুরু হল। লক্ষ্মীর ভূমিকায় মঞ্চস্থ হবার দিন মহাসমস্যা উপস্থিত হল— মেয়েরা পুরুষ দর্শকদের সামনে অভিনয় করতে অস্বীকৃত হল। তৎকালীন সময়ে এটা বিরাট সমস্যা ছিল, প্রায় অসম্ভবের ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই সমস্যার সমাধান করলেন। তিনি পুরুষ দর্শকদের বসার ব্যবস্থা করলেন চিকের আড়ালে। মেয়েরা মঞ্চে নৃত্যাভিনয় করলেন আর পুরুষরা আড়ালে থেকে নৃত্যাভিনয় দেখলেন। ঘরের মেয়েদের মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করানোর 'অপরাধে' পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল।

শান্তিনিকেতনে ছেলেদের মধ্যেই প্রথম নৃত্যচর্চা শুরু হয়েছিল ব্যায়াম বা শরীরচর্চার অঙ্গ হিসেবে। এরপর ত্রিপুরা থেকে আসেন বুদ্ধিমন্ত সিংহ নামে এক বিখ্যাত মণিপুরী নৃত্য

শিল্পী তিনি ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই সেটা বন্ধ হয়ে গেল। ১৯২৬ সালে কবি ত্রিপুরায় আসেন। ত্রিপুরার মহারাজা ছিলেন কবির বন্ধু। তিনি কবির সম্মানে এক নৃত্যানুষ্ঠানে-র আয়োজন করলেন— সেখানে মণিপুরী নৃত্য দেখে কবি মোহিত হলেন। এই নৃত্যের আত্মনিবেদনের ভঙ্গিটি কবিকে এত মুগ্ধ করেছিল যে তিনি তখনই মনস্থির করেছিলেন শান্তিনিকেতনে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই নৃত্য প্রচলন করবেন। এর কিছুদিন পরেই নবকুমার সিংহ শিক্ষক হিসাবে শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন। এই সময়ই কবি রচনা করলেন 'নটীর পূজা'। নটীর ভূমিকায় নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী দেবী কে মণিপুরী আঙ্গিকে শিক্ষা দেন। শান্তিনিকেতনের ধ্রুপদী নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা হয় মণিপুরী নাচ দিয়ে। 'নটীর পূজা' দিয়েই এর সূত্রপাত— এরপর থেকে 'ঋতু উৎসব' 'ঋতুরঙ্গ' 'নটরাজ' 'শ্রাবনগাথা' ইত্যাদিতে এবং সাধারণ নাটকের গানে বিশেষ করে নারী চরিত্রে মণিপুরী নাচের আঙ্গিকে নাচ করা হত।

নটীর পূজা নৃত্যাভিনয়ের পরই শুরু হল শান্তিনিকেতনের নৃত্যভাবনার যুগান্তকারী অধ্যায়। সে যুগের অবহেলিত নৃত্যকলাকে রবীন্দ্রনাথ নটীর "আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো" আত্মনিবেদন মূলক নাচের মাধ্যমে নৃত্যকে একটি পবিত্র আসনে স্থান দিলেন। নটী সাজ সজ্জা ছেড়ে বেরিয়ে এল ভিক্ষুনী রূপে। শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন "নটীর পূজা অভিনয় ঘটনাটি বাংলার সামাজিক ইতিহাসে একটি পরিচ্ছেদের সূচনা করল। কলিকাতার জনগণের সম্মুখে এই বোধ হয় প্রথম কোন ভদ্রগৃহস্থ ঘরের কন্যা ও বধূ নৃত্যকলার সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হল। নন্দলাল বসুর কন্য গৌরী সদ্য বিবাহের পর নটীর ভূমিকায় নামলেন। সেদিন থেকে বাঙালী মেয়েদের শৃঙ্খলিত পদযুগলে নুপুর নিক্কনের ধ্বনি নৃত্যের তালে মুখরিত হল"। (রবি জীবনী)।

রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল চেতনা সবসময়ই গ্রহণের পক্ষে— তাঁর শিল্প সত্ত্বা যেখান থেকে যা গ্রহণ করেছে তা সম্পূর্ণ তার নিজের মতো করেই গ্রহণ করেছে। ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলি যেমন গ্রহণ করেছেন তেমনি গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন আঞ্চলিক বা লোকনৃত্যকে বা বিভিন্ন দেশ-বিদেশের নৃত্যশৈলীকে শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে নৃত্য বিকাশের পথে মণিপুরী, কথাকলি, ভরতনাট্যম, কথক, গরবা, জুজুৎসু, নো কাবুকী ইত্যাদি সবকিছুই তিনি পরীক্ষা

নিরীক্ষা করেছিলেন, ভারতীয় আদর্শের যে আত্মনিবেদন— যা প্রকাশিত হয়েছে সংকীর্তন নৃত্যে, বাউল নৃত্যে- তা ও রূপ পেয়েছে রবীন্দ্র নৃত্য ভাবনায়। বাংলার জারি, সারি, রায়বেঁশে, গুজরাটের গরবা ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন লোকনৃত্য তাঁর নৃত্য চেতনায় বিশেষস্থান গ্রহণ করেছে। কবি একবার কথিয়াবাড়ে লোকনৃত্য দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে এক চাষী পরিবারকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এসেছিলেন। মেয়েদের দুই হাতে মন্দিরা বাজিয়ে নাচতে ও গাইতে দেখে তিনি গান বাঁধলেন "দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে'। 'এবেলা ডাক পড়েছে' গানটির নৃত্যে মিশেছে রায়বেঁশে ও জারি নৃত্যশৈলী। 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়' গানটির নৃত্য বাউল শৈলীতে কল্পনা করেছেন।

চিরপথিক রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন, পরিচিত হয়েছেন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর সঙ্গে। জাপানী নৃত্য, জাভা বলি দ্বীপের নৃত্য, হাঙ্গেরীয় লোকনৃত্য, পশ্চিমের ব্যালে, সিংহলের কান্ডি ইত্যাদি নৃত্যশৈলীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। বিদেশ থেকে ফিরেই কবি নৃত্যনাট্য রচনায় মন দিয়েছিলেন। বিদেশী রীতির নৃত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তাঁর শিল্পী সত্ত্বা বেছে নিয়েছে কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোন অংশটি বর্জনীয়। তাই তাঁর নৃত্যনাট্যে দেশি-বিদেশী নৃত্যশৈলীর সংমিশ্রন মিলেমিশে এককার হয়ে গেছে। বিদেশে ভ্রমণ তাঁর নৃত্য চেতনা ও ভাবনার দুয়ার খুলে দিল। নতুন ঝলমলে আলোয় নৃত্য এক নতুন রূপে তাঁর চোখে ধরা দিল। তারই ফলে শান্তিনিকেতনে নৃত্য এক বিশেষ স্থান অধিকার করল।

শান্তি নিকেতনে যখনই যে নৃত্যশিল্পীর আগমন ঘটেছে তখনই সেই নৃত্যধারা শান্তি নিকেতনে প্রযোজিত এবং সংযোজিত হয়েছে। নৃত্যনাট্যের পরিবেশনে মণিপুরী এবং কথাকলি নৃত্য আঙ্গিকের দিক বাদ দিলেও কথক ভারতনাট্যম, কান্ডি নাচ, গুজরাটি লোকনৃত্য কিছুই বাদ পড়ে নি। 'চিত্রাঙ্গদা'য় প্রথম যুগে মদনের চরিত্রে বলি দেশের নৃত্য শৈলীর প্রভাব পড়েছিল। বিশিষ্ট কথক নৃত্যশিল্পী আশা ওঝা শান্তি নিকেতনে আসার পর শ্যামা'র উত্তীয় চরিত্রে কথক নৃত্যের সংযোজন হয়ে ছিল। 'চিত্রাঙ্গদার' স্বরূপা চরিত্রে ছাপ পড়েছিল ভরতনাট্যমের কারন সে সময় ভারতনাট্যম শিল্পী মৃনালিনী সরাভাই শান্তি নিকেতনে ছিলেন, কোটালের চরিত্রে প্রভাব পড়েছে কান্তি নাচের কারন সিংহলবাসী অনঙ্গলাল তখন শান্তি

নিকেতনে ছিলেন, কেলু নায়কের জন্য কথাকলি আঙ্গিকে তৈরী হল প্রহরী রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্য গুলিতে তিনি পশ্চিমী ব্যালে নৃত্যরীতির সঙ্গে অপেরার যোগসাধন করেছেন। এক সময়ে শান্তি নিকেতনের বিশ্ববিদ্যা প্রাঙ্গণে এসে মিলে ছিল মণিপুরী কথাকলি কথক প্রভৃতি ভারতীয় ধ্রুপদীনৃত্য, জাভা, বলি, জাপান ইত্যাদি প্রাচ্যদেশীয় নৃত্যধারা এবং ব্যালে প্রভৃতি ইউরোপীয় নৃত্যাভিনয়। এদের সম্মিলনেই সৃষ্টি হয়েছিল একটি স্বতন্ত্র রবীন্দ্র নৃত্য ভাবনা।

নৃত্যের একটি সুন্দর সুমিত সংজ্ঞা দিয়েছেন "আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালনা করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবেগ। এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পরের মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভাবটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গিতে বিচিত্র করে জীবিকার প্রয়োজনে নয় সৃষ্টির অভিপ্রায়ে দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ তাকে বলি নৃত্য।" গুরুদেবের কাছে নৃত্যকলা মর্যাদা পেয়েছিল চলমান একটি শিল্পরূপে। তাঁর মনকে আলোড়িত করেছে নৃত্যের ছন্দের আনন্দ। সেই কারনেই যিনি শান্তিনিকেতনে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন নাচের একটি প্রাণবান্ আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ এক মহান আদর্শে নৃত্যধারাকে বইয়ে দিয়েছিলেন এবং নৃত্য যে নিছক লোকের মনোরঞ্জনের খোরাক নয় তা যে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। নৃত্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি যে বিশেস নৃত্যপদ্ধতি প্রচলন করেছেন তাকে কেউ বলেছেন 'শান্তিনিকেতনী নাচ' কেউ বলেছেন 'Tagore School Dance' কেউ বলেছেন 'Impressionist Type of Dance'। রবীন্দ্র সৃষ্ট এই বিশেষ নৃত্যটি ভারতের ধ্রুপদী ও আঞ্চলিক নৃত্য গুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তারমধ্যে ধ্রুপদী নৃত্য ও লোক বা আঞ্চলিক নৃত্যের আঙ্গিক প্রকরণ যেমন মিশেছে তেমনি ঘটেছে বিদেশী নৃত্যের অপূর্ব সম্মেলন। শুধুমাত্র বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর নির্যাসটুকু গ্রহণ করে সৃষ্টি করেছেন নব নৃত্যশৈলী। গুরুদেবের 'ঝুলন' কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যাভিনয় ভারতীয় নৃত্যজগতের একটি উল্লেখযোগ্য নতুন পরীক্ষা।

নৃত্যের চরম দুর্দিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শত কাজের মাঝেও নব নৃত্য আন্দোলনের কর্ণধার হয়ে নৃত্যের কালিমা ঘুচিয়ে দিয়ে স্বর্গীয় সুষমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন নব ব্যঞ্জনায় পরিলীক্ষিত করে। তিনিই প্রথম শান্তি নিকেতনে, বিশ্ব ভারতীতে নৃত্যকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত করেছেন।

আজ নৃত্যচর্চা সমাজে, স্কুল-কলেজে এমনকি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে এক বিশেষ স্থান লাভ করেছে। বিভিন্ন নৃত্যগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নৃত্য নিয়ে গবেষণা চলছে। আজ নানা নৃত্য উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। খাজুরাহো নৃত্য উৎসবের মতো ধ্রুপদী নৃত্য উৎসব যেমন হচ্ছে তেমনি বাংলার বাউল ছৌ টুসু ভাদু ইত্যাদি লোকনৃত্য উৎসবও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শান্তি নিকেতনের বর্ষা মঙ্গল বসন্তোৎসব ইত্যাদি তো রয়েছেই। আজ পাড়া বা ক্লাবের অনুষ্ঠানে নৃত্য প্রতিযোগিতা খুবই জনপ্রিয় শুধু তাই নয় যে কোন অনুষ্ঠানেই নৃত্য পরিবেশন অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ঘরে ঘরে আজ নৃত্যচর্চা চলছে মহা উৎসাহের সঙ্গে। প্রাক রবীন্দ্র যুগে এসব অকল্পনীয় ছিল—ছিল ভাবনার বাইরে। ভগীরথের মর্তে গঙ্গা আনয়নের মতো রবীন্দ্রনাথের নৃত্যকে গঙ্গার মতো পুত পবিত্র করে প্রবাহিত করেছেন মানুষের মনে, মননে, চেতনায় অনুভবে।

ত্রিপুরার সঙ্গীতচর্চার সেকাল ও একাল

ড. মণিকা দাস

ত্রিপুরার গুণী সন্তান তথা বাংলার স্বনামধন্য সঙ্গীতজ্ঞ ও সমালোচক রাজেশ্বর মিত্র রাজ্যের সঙ্গীত সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন:

আগরতলার সবচেয়ে বড় গৌরব তার সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য, এখনো আমরা সেজন্য গৌরব অনুভব করি, কিন্তু সবই শ্রুতি, স্মৃতি। আগরতলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে আমরা ডকুমেন্ট দিয়ে পাকা করে রাখিনি। ....আগরতলায় কোনো গোঁড়া মতবাদ ছিল না। ফলে নানা জাতীয় গাইয়ে বাজিয়ে আগরতলায় এসেছেন। ....গান-বাজনা বোঝবার মতো আশ্চর্য কান, সুরবোধ, তালবোধ সেকালে আগরতলাবাসী অনেকেরই ছিল। [১]

এ কথা সত্যি সেইরকম ভাবে ডকুমেন্ট দিয়ে পাকা করে না রাখা হলেও এই রাজ্যের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য যে সুপ্রাচীনকাল থেকেই ছিল গর্ব করার মতো তারই একটা রূপরেখা বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তকারে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

অনাদিকাল থেকে মানুষের জীবনে যেমন সঙ্গীতের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, সঙ্গীত সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বিষাদে পৃথিবীর সকল শ্রেণির, সকল জাতির মানুষের প্রধানতম আবেগময় আশ্রয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। তেমনি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরার অরণ্যময় পাহাড়ি জীবনেও সঙ্গীতের সুদূরপ্রসারী ভূমিকা আবহমান সময় থেকে আজও বিদ্যমান। প্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে পাহাড়ের কোলে জুমের ফসল কাটতে গিয়ে এখানকার যুবক-যুবতিরা আনন্দে নাচ-গান করে থাকে। মিশ্র বসতি সম্পন্ন ত্রিপুরার পাহাড়ি অঞ্চলে একদিকে হজাগিরি, গড়িয়া, লেবাং প্রভৃতি নানাধরনের নৃত্য, যাদুকলিজার বিবিধ সুর, চমপ্রেং নামে পাহাড়ি বাঁশির সুর ও খামের তালে আনন্দমুখর হয়ে উঠে, অন্যদিকে বাঙালি অংশের লোকেরা মাতোয়ারা হয় নানাধরনের লোকসঙ্গীত, কীর্তন, ভজন পুরাতনী ও আধুনিক বাংলাগানে এবং মণিপুরী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের হোলি, রাস, ও নানাবিধ বৈষ্ণব পদাবলীর গানে। সর্বোপরি যেটা বলতে হয়, তা হল

এখানকার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চা যার প্রধান উৎস ও প্রেরণা ছিল ত্রিপুরার রাজদরবার। ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গীতপ্রিয়তার কথা সকলেই জানেন। সুপ্রাচীনকাল থেকেই এখানকার রাজদরবারকেন্দ্রিক সঙ্গীতচর্চার উজ্জ্বল ধারাবাহিক ইতিহাস রয়েছে। সেই গৌরবময় অধ্যায় সম্পর্কে হয়তো বহির্বিশ্ব তথা ভারতের অন্যান্য অংশের অধিকাংশেরই অজানা। যেহেতু ত্রিপুরার রাজন্য কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যেই তার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের উৎস নিহিত হয়ে আছে সেজন্য অতীতের সেই রাজন্য সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের উৎস ও ধারা সন্ধান করা প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। ত্রিপুরার সঙ্গীতচর্চা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে গেলে আমাদের তার উৎসমুখের সন্ধান করতে হবে, যেতে হবে ইতিহাসের পাতায় সোনালী সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের সন্ধানে।

ত্রিপুরার রাজ-ইতিহাস *রাজমালা* গ্রন্থে আছে যে রাজা ত্রিপুরের সময় থেকেই এখানে সঙ্গীত ও নৃত্যের চর্চা ছিল। ত্রিলোচনের সময় চতুর্দশ দেবতার প্রাঙ্গনে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে পূজা সম্পন্ন হত। পরবর্তীকালে রাজা দেবমাণিক্যের আমলেও নৃত্য-গীত চর্চার উল্লেখ রাজমালায় আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা ধন্যমাণিক্য (রাজত্বকাল : ১৪৯০-১৫২০) সুদূর মিথিলা থেকে সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পী আনিয়েছিলেন। তাঁর প্রজাদের নৃত্যগীতে তালিম দেওয়াবার জন্য। যার উল্লেখ *রাজমালা*-তে রয়েছে:

ত্রিহূত দেশ হইতে নৃত্যগীত আনি।
রাজ্যতে শিখায় গীতিনৃত্য নৃপমণি।।
ত্রিপুর সকলে গীত সেই ক্রমে গায়।
ছাগ অন্তে (অন্ত্রে) তার যন্ত্রে ত্রিপুরে বাজায়।।[২]

ধন্যমাণিক্যের রাজসভায় সে সময় যে সঙ্গীতচর্চা ও সঙ্গীত রচনা হত ড. সুকুমার সেনের লেখা থেকে তা জানতে পারা যায়। নেপাল থেকে মৈথিল ভাষায় রচিত যে বিদ্যাপতির পদাবলির পুঁথি পাওয়া গেছে সেই পুঁথিটিকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করেই শ্রীযুক্ত সুভদ্রা ঝা প্যারিসে গিয়ে জুল ব্লথের অধীনে বিদ্যাপতি বিষয়ক গবেষণা করেছিলেন। সেই পুঁথির একটি পদের ভনিতায় 'ধন্যমালিক' নাম লেখা আছে। এ-প্রসঙ্গে গবেষকগণ মনে করেন যে মৈথিল পুঁথিতে 'ল' কার ও 'ন' কারের বিপর্যয় পায়ই দেখা যায়। সুতরাং

এই নামটি যে ধন্যমাণিক্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁরা বাংলাদেশের লেখা প্রথম ব্রজবুলি পদের মধ্যে এটিকেই প্রথম বা প্রথম কয়েকটির মধ্যে অন্যতম বলে দাবি করেন। তাঁদের দাবি এই রচনা রাজপণ্ডিতের। তাঁদের মতে 'ভণিতা' দেখিলেই বলা যায় পদটি ত্রিপুরার রাজসভায় লেখা। ভণিতায় ছিল—

বৈরিহুকে এক দোষ মরসিতা
রাজপণ্ডিত ভনে
বারি কমলা কমল বসিয়া
ধন্যমাণিক জানে।[৩]

অসমিয়া ভাষায় রত্নকন্দলী শর্মা ওঅর্জুনদাস বৈরাগী লিখিত 'ত্রিপুরা বুরুঞ্চি' (১৬৪৬ শকাব্দ) পুস্তকে ত্রিপুরার সঙ্গীতচর্চা সম্পর্কে কিছু তথ্য রয়েছে—

গুণী গায়নে ও তালে খোলে ছংকীর্তন ধারণে গীত গাইছিলেন।[৪]

('ত্রিপুরা বুরুঞ্জি', পৃ: ৬০) মদনপূজা উপলক্ষ্যে ত্রিপুরায় যে সঙ্গীতের আসর বসত তারই বর্ণনা রয়েছে গ্রন্থটিতে।

১৫০১ সালে ধন্যমাণিক্য শক্তিপীঠস্থান রাঙামাটিতে (বর্তমান উদয়পুর) ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবহমানকাল থেকে বৃহত্তর ত্রিপুরার অনেক শক্তিসাধক এখানে এসে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেই সব সিদ্ধাগণের বেশিরভাগ সঙ্গীতের মাধ্যমে সাধনা করতেন। তাঁদের শক্তিসঙ্গীত আজও লোকগায়ক বা লোককবিদের মুখে শুনতে পাওয়া যায়।

সর্বশেষ যে চারজন রাজা প্রায় শতবর্ষব্যাপী সময় ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে রাজত্ব করেছেন তাঁরা হলেন— বীরচন্দ্র মাণিক্য (রাজত্বকাল: ১৮৬২-১৮৯৬), রাধাকিশোর মাণিক্য (রাজত্বকাল: ১৮৯৬-১৯০৯), বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য (রাজত্বকাল: ১৯০৯-১৯২৩), এবং বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য (রাজত্বকাল: ১৯২৩-১৯৪৭)। এই চারজনের রাজত্বকালেই ত্রিপুরার সঙ্গীতচর্চা এক উল্লেখযোগ্য মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছিল সেই বীজভূমির উপরই দাঁড়িয়ে আছে বর্তমান ও ভাবীকালের সঙ্গীতপ্রজন্ম।

বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকাল থেকেই ত্রিপুরার আধুনিকতার সুচনা ঘটে। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে যেমন তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল তেমনি ক্যামেরা ও ক্যানভাসে ছিলেন সুনিপুণ শিল্পী। সেই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের নাম—

ফরাসী পত্রিকায় ও আমেরিকান ফটোগ্রাফার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর সার্থক শিল্পসৃষ্টির জন্য।। তাঁর রাজসভায় উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে একজন ফরাসী চিত্রশিল্পী সভাশিল্পীরূপে বিরাজ করতেন। তাঁর নাম যতটুকু জানা যায় এপোলোনিয়াস।[৫]

সঙ্গীত বিশারদ মহারাজা বীরচন্দ্র নিজে অনেক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। আজীবন তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। উদার ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির রাজা বীরচন্দ্রের সভাতে ধ্রুপদী সঙ্গীতের চর্চা যেমন হত, তেমনি হত বৈষ্ণব সাহিত্যের চর্চাও। বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতি ছাড়াও শ্রী হট্টয় সংস্কৃতির একটা বড়ো প্রভাব ছিল সেখানে। রাজসভাতেই ছিলেন দুই অন্যতম সঙ্গীত বোদ্ধা রাধারমন ঘোষ ও মদনমোহন মিত্র। রাধারমন ঘোষের ছিল বৈষ্ণব সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং মদনমোহন মিত্র ছিলেন সঙ্গীত কবিতায় অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি। ভক্তগায়ক ও কীর্তন রচয়িতা মদনমোহন মিত্র সেই সময় বহু কীর্তন সঙ্গীত রচনা করেছিলেন যা প্রায় সকলের মুখে মুখে ফিরত। তিনি 'কবিতা কদম্ব' ও জীবনময় কাব্য' নামে দুটি কাব্যগ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন।

ভারতের তদানীন্তন গুণীজনেরা বীরচন্দ্রের রাজদরবার আলো করে রেখেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে যে সব ভারতশ্রেষ্ঠ উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিল্পীরা এ রাজ্যে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন তানসেনের বংশধর কাশেম আলি, ভারত শ্রেষ্ঠ এই রবাববাদক ছিলেন প্রসিদ্ধ গায়ক সাদেক আলির ঘরানার শিষ্য। প্রথম জীবনে কাশেম আলি রামপুরের নবাব ও নেপালের রাজার দরবারে ছিলেন। পরে বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময়ে ত্রিপুরা দরবারে আসেন। তিনি ভালো সুরবীণ, বীণা ও সুরশৃঙ্গার বাজাতে পারতেন।

চন্দননগর নিবাসী পঞ্চানন মিত্র খুব ভালো পাখোয়াজ ও তবলা বাজাতে পারতেন, উচ্চশিক্ষিত ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ এই শিল্পী পাঁচুবাবু পরবর্তী সময়ে প্রথমে রাজপ্রাসাদের দেওয়ান ও ক্রমশ মহারাজের একান্ত সচিব পদে যোগ দিয়েছিলেন এবং একাদিক্রমে বাইশ বছর

এখানে অতিবাহিত করেছিলেন। এই সময়ে বীরচন্দ্রের সভায় একে একে স্থান পায় গোয়ালিয়র রাজ্যের সুরশিঙা ও এসরাজ বাদক হাইদার খাঁ, সুর-বীণ ও সেতার বাদক নিসার হোসেন, কাশ্মীরবাসী নাট্যাচার্য কুলন্দর বক্স, সেতার বাদক নবীন চাঁদ গোস্বামী, বেহালা বাদক ওস্তাদ হরিদাস পাগলা, পাখোয়াজ বাদক রামকুমার বসাক, গায়ক (টপ্পা ও খেয়াল) ভোলানাথ চক্রবর্তী, ঢাকার সাধু তবলচি, ধ্রুপদী শিল্পী ক্ষেত্রমোহন বসু, সঙ্গীত ও নৃত্যে দক্ষ ইমামীবাঈ, বারানসীর মধুকণ্ঠী চাঁদা বাঈজী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। কালিকচ্ছ নিবাসী শরৎ বাইন মহারাজ বীরচন্দ্রের সভায় জলতরঙ্গ বাজাতেন। জানা যায়, ১৮৭৫ খ্রিঃ সপ্তম এডোয়ার্ডের সম্মানার্থে কলকাতায় দেশীয় রাজন্যবর্গের উদ্যোগে বেলগাছিয়া রাজবাড়িতে এক জলসার আয়োজন করা হয়েছিল। ভারতের প্রখ্যাত শিল্পীরা এই সভাতে আমন্ত্রিত ছিলেন। *কতকাল পরে বল ভারতবে* ও *দুঃখসাগর সাঁতারি পার হবে*—এই দুটি বিখ্যাত সঙ্গীত জলতরঙ্গে বাজিয়ে তিনি সকলকে অভিভূত করেছিলেন।'[৬]

আমরা জানি, বর্ধমানের (বাঁকুরা) বনবিষ্ণুপুরের যদুনাথ ভট্টাচার্য ওরফে যদুভট্টের কাছে রবীন্দ্রনাথও বাল্যকালে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। তাঁর মতো গুণী গায়ক ভারতবর্ষে খুবই কম ছিল। তিনি বীরচন্দ্রের দরবারে একনাগারে ছয় বৎসর কাটিয়েছিলেন। যদুভট্টের গানে মুগ্ধ হয়ে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁকে 'তানরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বীরচন্দ্রের প্রশস্তিমূলক যে দুটি গান যদুভট্ট রচনা করেছিলেন সেগুলি হল—

১) *শম্ভুশিব মহেশ আদি ত্রিলোচন*
ভবদয় হর ভবেশ দীননাথ
....
অতি অপূর্ব হর গুণ গাওয়া রিপুরেশ
বীরচন্দ্র নরপতি প্রকাশ কর নাথ
সুঅধর ধরে সুমধুর তান সাচি সুন্দর।[৭]

২) *শম্ভু হরপদ যুগধ্যধ্যান বখণী নাতরঙ্গ*
তেরি কিরত্তন দিনায়না গাওত জনসমাজ—
জয় ত্রিপুরা নাথ দয়াল বীরচন্দ্র
গুণীজন প্রতিপালক দাতা।[৮]

এই দুটি গানের অনুকরণে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ দুটি গান রচনা করেন যার উল্লেখ পাওয়া যায় ইন্দিরা দেবীর 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে ত্রিবেণী সঙ্গম'-এ—রবীন্দ্রনাথের সেই গান দুটি হচ্ছে (১) ভক্ত হৃদি বিকাশ এবং (২) শান্তি কর বরিষণ।

বীরচন্দ্র মাণিক্য ছিলেন খাঁটি জহুরী, তিনি হীরের পরখ জানতেন। সে কারণেই তো তনি 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে খুঁজে নিলেন সেই বালক কবিকে, একান্ত সচিব রাধারমন ঘোষকে পাঠালেন কিশোর কবিকে অভিনন্দিত করতে। এই ঘটনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

সেই সময় আমাকে এবং আমার লেখা সম্বন্ধে খুব অল্প লোকই জানতেন। আমার পরিচয় তখন কেবল আমার আত্মীয় স্বজন ও নিকটতম বন্ধুদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একদিন এই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের দূত আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। বালক আমি, সসঙ্কোচে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম— [৯]

মহারাজ বীরচন্দ্র প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছিলেন—

জীবনে যে যশ পাচ্ছি পৃথিবীর মধ্যে তিনিই তাঁর সূচনা করে দিয়েছিলেন, তাঁর অভিনন্দনের দ্বারা। তিনি আমার অপরিণত আরম্ভের মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পেয়েই তখনি আমাকে কবি সম্বোধনে সম্মানিত করেছিলেন। যিনি উপরের শিখরে থাকেন, তিনি যেমন যা সহজে চোখে পড়ে না তাকেও দেখতে পান, বীরচন্দ্রও তেমনি সেদিন আমার মধ্যে অস্পষ্টকে স্পষ্ট দেখেছিলেন। [১০]

উল্লিখিত কথাগুলো রবীন্দ্রনাথ ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১২ ফাল্গুন আগরতলা সফরকালে এখানকার উমাকান্ত একাডেমির হলে স্থানীয় 'কিশোর সাহিত্য সমাজ'-এর সম্বর্ধনার উত্তরে বলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সর্বপ্রথম কবিস্বীকৃতি প্রদান ছিল বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ। তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কাজ ও সুচেতনা ত্রিপুরার সংস্কৃতির ইতিহাসকে গৌরবোজ্জ্বল করেছে। বীরচন্দ্র মাণিক্যের লেখা অতি উচ্চমানের ছয়টি কাব্যগ্রন্থ — 'হোরি', 'ঝুলন', 'অকালকুসুম', 'উচ্ছ্বাস', 'সোহাগ', 'প্রেম-মরীচিকা' প্রভৃতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও আশ্চর্যান্বিত করেছিল। বীরচন্দ্র মাণিক্যের কন্যা কবি অনঙ্গমোহিনী দেবী যেমন বহু সঙ্গীত রচনা করে গেছেন তেমনি রাজপুত্র কুমার মহেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মণ চিত্রশিল্পী

ও মার্গসঙ্গীতে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি চিত্রকলা বিষয়ক গ্রন্থ 'চিত্রশিক্ষার সোপানে' (১৯০৩ খ্রিঃ) রচনা করেছিলেন এবং রাজকুমার বিমলচন্দ্র রচনা করেছিলেন বৈষ্ণব কাব্যগ্রন্থ 'গোপবালা' (১৯০৪ খ্রিঃ)।

শচীনকর্তা তাঁর 'ত্রিপুরা সুর ও সঙ্গীত সাধনায়' প্রবন্ধে বলেছেন :

মহারাজ বীরচন্দ্রের সভা ছিল নবরত্নের মিলনভূমি। নবার ওয়াজেদ আলির দরবার বাদ দিলে ত্রিপুরার বীরচন্দ্রের সঙ্গীত দরবার ছিল সে যুগে সারা ভারতের মধ্যমণি স্বরূপ।[১১]

বীরচন্দ্রের পুত্র মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার গুণপনা পেয়েছিলেন। কিশোর বয়সেই তিনি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। কবি হেমচন্দ্র আচার্য ও দীনেশ সেন-কে তিনি রাজদরবারের কোষাগার থেকে আজীবন অর্থ সরবরাহ করে গেছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর যখন অর্থাভাবে বিজ্ঞানচর্চা বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে জানতে পেরে মহারাজ দফায় দফায় তাঁকে সর্বমোট পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের প্রারম্ভ থেকেই মহারাজ বার্ষিক আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে তাঁর দানশীলতার কথা স্মরণ করে ত্রিপুরাবাসীরা আজও গৌরব বোধ করে। রাধাকিশোর মাণিক্যের উৎসাহে ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৭ আষাঢ় রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় আসেন। রাধাকিশোর মাণিক্যের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্কের স্মারক হিসেবে ২০ ফাল্গুন ১৩০৬ বঙ্গাব্দে 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ মহারাজ রাধাকিশোরের নামে উৎসর্গ করেন এবং ১৩১৭ বঙ্গাব্দে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যকে সম্বর্ধিত করার জন্য কলকাতার অভিজাত সঙ্গীতসমাজ এক সম্বর্ধনার আয়োজন করলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাধাকিশোরের প্রশস্তি করে একটি গান রচনা করেন। গানটি হল—

রাজ অধিরাজ তব ভালে জয়মালা
ত্রিপুরা পুরলক্ষ্মী বহে তব বরণ ডালা।
গুণী রসিক উদার সেবিত তব দ্বারে।
মঙ্গল বিবাহিত বিচিত্র উপচারে।
তরুণ ভবমুখচন্দ্র করুণ রস ঢালা।

দীনজন দুঃখ হরণ নিপুণ তব পাণি।
ক্ষীণজন ভয়তারন অভয় তব বাণী।
গুণ অরুণ কিরণে তব সব ভুবন আলো। [১২]

এই গানটি নাটোরের রাজা জগদীন্দ্রনাথ সেই সভায় পরিবেশন করেছিলেন এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিসর্জন নাটকের রঘুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সেই সভার মান বর্ধিত করেছিলেন। মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যও 'বৃন্দাচরণ চন্দ্র' এই ছদ্মনাম নিয়ে বহু বৈষ্ণব সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। মহারাজাদের অনুপ্রেরণায় রাজমহিষীগণও তখন সঙ্গীত রচনা করতেন। মহারানি তুলসীবতী ও মহারানি প্রভাবতী দেবী বহু সঙ্গীত রচনা করেছেন।

রাধাকিশোরের পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হওয়ার আগেই পুরাতন আগরতলায় পিটাঙ্গুরী বাবাজী নামে এক সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তিনি সেতার বাজিয়ে গান করতেন। বীরেন্দ্রকিশোর সেই বাবাজীর কাছেই প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা করেন।

পরবর্তীকালে ১৩০৯ বঙ্গাব্দে ঢাকার বিখ্যাত টপ্পা গায়ক হসনু মিঞা এবং পাখোয়াজ বাদক উপেন্দ্র বসাক ত্রিপুরায় আসলে তাঁদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা নেন। রাজ্য পরিচালনার দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তাঁর পিতা ও পিতামহদের মতোই সাংস্কৃতিক গুণের উত্তরাধিকারী ছিলেন। ছবি আঁকার পাশাপাশি তিনি বাঁশি, সেতার, এসরাজ ও মণিপুরী খোল বাজাতে জানতেন। তাঁর টোড়ি রাগে সেতারবাদন ও মালকোষ রাগে বংশীবাদনের গ্রামাফোন কোম্পানির রেকর্ড কোম্পানির শত অনুরোধেও তিনি বানিজ্যিক কারণে বাজারে ছাড়তে রাজি হননি। নাট্যশিল্পে তাঁর নিজের ও রাজমহিষী প্রভাতি দেবীর অনুরাগের ফলই হল নাট্যমঞ্চ 'পুষ্পবন্ত নাট্যসমাজ'। তাঁর দরবারে এসেছিলেন খেয়াল গায়ক তাসাদার হোসেন, ধ্রুপদ গায়ক কাল্লু খান, সুরবাহার বাদক এমদাদ খান, তবলা বাদক প্রসন্ন বনিক, শ্যাম সেতারী, সানাই বাদক মুন্না খাঁ প্রমুখ শিল্পীরা। স্থায়ীভাবে থেকে যারা সঙ্গীত চর্চা করতেন তাঁরা হলেন গায়ক রোহিণী জড়িয়া, তবলা বাদক ভগবান ঠাকুর ও অমর চক্রবর্তী গায়ক রামচন্দ্র ঠাকুর প্রমুখ। তাঁর সাহিত্যানুরাগের কারণেই তিনি রাজমালাকে পুনঃসম্পাদিত করান এবং আগরতলায় কিশোর সাহিত্য সমাজ গড়ে তোলেন। ১৩৬২ বঙ্গাব্দে মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় আসেন। তিনি কবির আমন্ত্রণে

শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে বুদ্ধিমন্ত সিংহকে শান্তিনিকেতনে প্রেরণ করেন মণিপুরী নৃত্যশিক্ষা দেওয়ার জন্য।

১৯২৮ সালে উত্তরাধিকারসূত্রে বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনিও সঙ্গীতে পারদর্শী এবং সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের প্রথমদিকে মহারাজের সঙ্গীত সহচর বলতে ছিলেন সঙ্গীতাচার্য ও সুদক্ষ চিত্রশিল্পী ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মণ। উভয়ের মিলিত ভাবনার সূত্রে মহারাজ বীরবিক্রম লিখেছিলেন 'রাধাকৃষ্ণ লীলাবিলাস', 'চাঁদ কুমুদিনী' প্রভৃতি নৃত্যনাট্য যেগুলি পরবর্তী কালে কলকাতায় ত্রিপুরা হাউসে মঞ্চস্থ হবার পর উচ্চ প্রশংসিত হয়। বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের লেখা 'হোলি' গ্রন্থটি মার্গসঙ্গীতে তাঁর দক্ষতার পরিচয় বহন করে। বীরচন্দ্রের মতো বীরবিক্রমের রাজসভায়ও বহু গুণী শিল্পী রাজদরবারকে অলংকৃত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইনায়েৎ খাঁ, মজফফর খাঁ, মাজিদ খাঁ, আদম বকস, মুন্না খাঁ, সেতারী প্রীতম গিরি, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এবং তাঁর বড়ো ভাই আফতাবউদ্দিন খাঁ ও আয়েত আলি খাঁ, কালীভক্ত ওস্তাদ গুল মহম্মদ এবং তাঁর পুত্র ওস্তাদ আলি আহম্মদ খাঁ সাহেব, গহরজান, আখতারীবাঈ নূরজাহান, মধুকলী কীর্তন গায়িকা পান্নাময়ী, পাখোয়াজী উপেন্দ্র বসাক, যন্ত্রশিল্পী তিমিরবরণ ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রনাথ বসু, সানাই বাদক নাজির হোসেন, অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে ও দ্বিজদাস শর্মারায়, লোকসঙ্গীত শিল্পী সাহেব আলি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৯ সালের ৭ জানুয়ারি যখন মহারাজ বীরবিক্রম কবির নিমন্ত্রণে বিশ্বভারতীতে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে দেখে কবি আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

...আজকের এই অস্তোমুখ সূর্যের মতোই আমার হৃদয় আমার জীবনের পশ্চিম দিগন্ত থেকে তোমার প্রতি তাঁর আশীর্বাদ বিকীর্ণ করছে। তোমার সঙ্গে আজ আমার মিলন আরেক দিনকার শুভ সম্মিলনের আলোকেই উদ্দীপ্ত হয়ে দেখা দিল। ....আজ এ কথা গর্ব করে তোমাকে বলবার অধিকার আমার হয়েছে। যে ভারতবর্ষের যে কবি পৃথিবীতে সমাদৃত তাঁকে তাঁর অনতিব্যক্ত খ্যাতির মুহূর্তে বন্ধুভাব স্বীকার করে নেওয়াতে ত্রিপুরার রাজবংশ গৌরব লাভ করেছেন। তেমন গৌরব বর্তমানে ভারতবর্ষে কোনো রাজকুল আজ পর্যন্ত পান নি। [১৩]

(শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দনপত্র থেকে উদ্ধৃত)

১৯৪১ সালে ত্রিপুরার রাজদরবারে রাজকীয় আড়ম্বরে কবির অশীতিতম জন্মজয়ন্তী মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের উদ্যোগে পালিত হয়েছিল। ১৮৮২ সালে কবির প্রতিভার বিকাশলগ্নে মহারাজ বীরচন্দ্র কবিকে যে সম্মান জানিয়েছিলেন তাই পূর্ণরূপ পেল তাঁরই প্রপৌত্র বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের রাজকীয় সনদে কবির অন্তিম সময়ে কবিকে 'ভারতভাস্কর' উপাধি প্রদানের মধ্য দিয়ে। রোগশয্যায় অসুস্থ কবি রাজদূতের হাত থেকে রাজকীয় সম্মান পেয়ে বললেন—

সেই রাজবংশের সেই সম্মানমূর্ত পদবী দ্বারা আমার স্বল্পাবশিষ্ট আয়ুর দিগন্তকে আজ দ্বিপ্যমান করেছে। [১৪]

১৯৩৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর কলকাতা সেনেট হলে বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের উদ্বোধন করেছিলেন মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর। সেদিনের অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য শিল্পী ছিলেন গৌরীপুরের কুমার বীরেন্দ্রকিশোর, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরু গাঙ্গুলী, বালা সরস্বতী, শচীন দেববর্মণ, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ প্রমুখ।

ত্রিপুরার রাজন্য সংস্কৃতির এইরকম অসাধারণ একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশের জঠর থেকেই বিকশিত হয়েছিল কুমার শচীন দেববর্মণ। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ ও শচীনকর্তা এই দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক পৃথিবীর সঙ্গীতাকাশে ও সঙ্গীত মানচিত্রে ত্রিপুরাকে এক অনন্য স্থান করে দিয়ে গেছেন। ত্রিপুরার সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এঁদের প্রসঙ্গ সর্বপ্রথমেই আসবে। ত্রিপুরার সুযোগ্য সন্তান ত্রিপুরার রাজপুত্র কুমার শচীন দেববর্মণ (১ অক্টোবর, ১৯০৬) হলেন সেই ত্যাগী সঙ্গীত-সন্নাসী যিনি রাজকুমার হয়েও সমস্ত বৈভবকে বিসর্জন দিয়ে সঙ্গীত পাগল হয়ে মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে বৃহত্তর ত্রিপুরার ও পূর্ববঙ্গের মাঠেঘাটে নদীনালায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, প্রকৃতি থেকে রশদ নিয়ে তাঁর সুরের ভুবনকে করেছেন পরিপূর্ণ, রাজকুমার থেকে হয়ে গেলেন সুরের জগতের বাদশা। যার গৌরবে তাঁর মাতৃভূমি চিরদিন গৌরবান্বিত হবে।

আলাউদ্দিন খাঁ-র জন্মভূমি ছিল ত্রিপুরা জেলার শিবপুর গ্রামে। মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের আমল থেকেই আলাউদ্দীন খাঁ-র সঙ্গে ত্রিপুরার রাজদরবারের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের

দরবারে বেশ কিছুদিন গানবাজনাও করেছিলেন। ওই সময়ে মহারাজা কর্তৃক খাঁ সাহেবের দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন অনিলকৃষ্ণ দেববর্মণ। অনিলকৃষ্ণকে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য সম্পর্কে তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আমরা অনুভব করতে পারি, লিখেছেন—

আমার অন্নদাতা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরের শ্রীচরণ কৃপায় আশীর্বাদ, আদর, যশ ও সম্মান পাইতেছি। আরেক জায়গায় লিখেছেন : শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরের শ্রীচরণে সেবকের কোটি কোটি প্রণাম জানাইবেন, এ অধম মহারাজর কুসন্তান। এই অধম সন্তানের ত্রুটি মার্জনা করিতে নিবেদন করিবেন।[১৫]

১৯৪৭ সালের ১৭ মে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য পরলোক গমন করেন। ১৯৪৭ সালের ১১ নভেম্বর মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবী ঘোষণা করেন যে প্রয়াত মহারাজের সিদ্ধান্ত ছিল যে ত্রিপুরা ডোমিনিয়নে যোগ দেবে। ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরা স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভূক্ত হয় এবং ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। এইভাবে মহারাজের ইচ্ছেতেই ত্রিপুরায় রাজতন্ত্রের অবসানের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের সময় থেকেই ক্রমশ প্রাসাদকেন্দ্রিক সঙ্গীতচর্চার বন্ধন শিথিল হয়ে আসে এবং ক্রমশ শুরু হয় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সঙ্গীত শিক্ষার নতুন অধ্যায়।

রাজন্য সংস্কৃতির এই ধারা পরবর্তীকালে যার উপর বর্তায় তিনি ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মণ। ঠাকুর অনিলকৃষ্ণও যে কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন একথা আগেই বলা হয়েছে। ত্রিপুরার নিজস্ব রাগ হিসেবে তিনি 'ত্রিপুরাবতী' ও 'ত্রিপীসারং' নামে দুইটি রাগ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বহু হোলি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন এবং রচনা করেছিলেন সঙ্গীতগ্রন্থ 'নাদলিপি' প্রথম খণ্ড। লক্ষ্ণৌ এর 'ভাতখণ্ডে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' গড়ে উঠার চার বছর আগে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুর অনিলকৃষ্ণও সর্বপ্রথম আগরতলায় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান 'ত্রিপুরা ঐক্যতান বাদন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমস্ত ত্রিপুরা জেলার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষার্থীরা এখানে আসতেন। বাংলার বাউল, কীর্তন, টপ্পা, কবিগান মণিপুরী বা নেপালীগীতও এখানে চর্চা করা হত। সঙ্গীতকে কেন্দ্র করেই আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের সঙ্গে অনিলকৃষ্ণের

বন্ধুতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বন্ধুতার কারণে ও সঙ্গীত শিক্ষায়তনটিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালেও আলাউদ্দীন খাঁ-র ত্রিপুরাতে যাতায়াত ছিল।

এক সময় উজীর বাড়ির 'অনিল সঙ্গীত বিদ্যালয়'-কে কেন্দ্র করে যন্ত্রসঙ্গীতে এক ঝাঁক শিল্পী উঠে আসেন। তাঁদের মধ্যে অশ্বিনী বিশ্বাস, যুগলকিশোর সরকার, তপন নন্দী, মানিক হালদার, উৎপলকৃষ্ণ দেববর্মা, অনাথবন্ধু দেববর্মা, শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য, কালীকিঙ্কর দেববর্মা, ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক, সুমেধা দেববর্মা প্রমুখ। এ রাজ্যের বিশিষ্ট ঠুমরী গায়ক ছিলেন রাজেশ্বর বনিক। তবলায় ছিলেন শচীন চক্রবর্তী ও কেষ্ট দাস, কেষ্ট দাস ওস্তাদ মজিদ খানের সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ-এর সঙ্গে তিনি সঙ্গত করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। লহরী দেববর্মা ও পুলিন দেববর্মা এই দুজনও উজীর বাড়ির অনিল সঙ্গীত বিদ্যালয় থেকেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। 'আলাউদ্দীন সঙ্গীত সভায়' ত্রিপুরার প্রবীন সরোদ শিল্পী শিউলি দেববর্মা, ত্রিপুরার ৭ই সময়কার সাঙ্গীতিক পরিবেশ কেমন ছিল তার স্মৃতি রোমন্থন করেছেন—

তখনকার গানবাজনার পরিবেশ বর্তমানের মত ছিল না। 'নাদপীঠ' স্কুলের খুব কাছেই ছিল বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ পুলিন দেববর্মার নিজস্ব বাড়িতে একটি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়। ....পাশাপাশি দুটি বিদ্যালয় সঙ্গীত মুখর থাকত। রাস্তাদিয়ে যাওয়ার পথে লোকেরা ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকত মুগ্ধ হয়ে। ...আরও মনে পড়ে ছোটবেলায় সঙ্গীতসম্রাট পুলিন দেববর্মার বড় ভাই নীলু ঠাকুরের বাড়িতে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শ্যামল মিত্র, অভিনেতা অসিতবরণ, অভিনেত্রী মঞ্জু দে প্রমুখ এসেছিলেন এবং ঘরোয়া জলসার আয়োজন হয়েছিল। আমি 'কেদার রাগ বাজিয়েছিলাম।[১৬]

তিনি আরো বলেছেন যে—

পঞ্চাশের দশক আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। ...মাত্র দশ বৎসর বয়সে আমাদের বাড়ির শিল্প-সাংস্কৃতিক পরিবেশ, সাংগীতিক পরিমণ্ডল আমাকে উৎসাহিত করেছিল। আমার বাবা স্বর্গীয় প্রমোদ দেববর্মাকে দেখেছি দরাজ গলায় গান গাইতে। ...আমাদের প্রশস্ত বাড়ির মাঠপ্রাঙ্গনে একটি কদম গাছের তলায় জেঠতুতো দাদা লহরী দেববর্মার 'নাদপীঠ' নামে যন্ত্রসঙ্গীত বিদ্যালয় ছিল। মায়ের ইচ্ছায় যন্ত্র সঙ্গীতে পারদর্শী এই দাদার কাছে সেতার

শিক্ষায় হাতেখড়ি হল। তখন আরেক পিসতুতো দাদা চিত্তরঞ্জন দেববর্মা যিনি সি.ডি বর্মণ নামেই খ্যাত, তিনি আমাদের বাড়িতেই মানুষ হয়েছেন এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নামকরা এস্রাজ বাদক। আমার নিজের দাদা কৃষ্ণকুমার দেববর্মার গানে ও সেতারে পারদর্শিতার কথা তখনকার সঙ্গীত জগতের অনেকেরই জানা। তাঁরা দুজনেই বিভিন্নভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। লহরীদার স্কুলে অনেক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ইন্দ্রজিৎ দেববর্মা, শ্রী ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক, শ্রীমতি রাজলক্ষ্মী দেবী, অপর্ণা দেববর্মা, অমিতা চৌধুরী, দিলীপ দেববর্মা, অভয়াদি, উপমাদি, প্রতিমাদি ছাড়াও আরো অনেকে সেতার, সরোদ, বেহালা, এস্রাজ, তবলা শিখতেন। বহু তবলচী আসতেন। এর মধ্যে যাদের কথা প্রায়ই মনে হয় শ্রী দুলাল রায় বর্তমানে তিনি সন্তুর বাদক হিসেবে খ্যাত, অশ্বিনী বিশ্বাস, যুগল সরকার, তপন নন্দী, চিত্ত সেন, দুলাল চৌধুরী প্রমুখ। আরো কত সঙ্গীতপ্রেমীদের যে সমাগম হত বলার নয়। এর মধ্যে অনেকেই পরবর্তী সময়ে সঙ্গীত জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সারা দিন-রাত লহরীদা সঙ্গীত সাধনা করতেন। কী করে যে সব যন্ত্র যেমন সেতার, সরোদ, বেহালা, এস্রাজ, তবলা বাজাতেন আমি অবাক হয়ে যেতাম। [১৭]

বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সমালোচক ও লেখক রাজেশ্বর মিত্র উমাকান্ত স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি লিখেছেন—

আগরতলায় আমার বন্ধুরা নেহাৎ অবসর বিনোদনের জন্যে যে রকম এস্রাজ বাজাতেন তা বর্তমান রেডিওর অনেক আর্টিষ্টের ঈর্ষার বস্তু হতে পারে। রীতিমত বড় বড় তানের কাজ তাঁরা এস্রাজে দেখাতেন। ..ঠাকুর লোকেরা অনেকেই তবলা বাজাতেন চমৎকার। খুব আড়িতে গাওয়া গানের সঙ্গেও তাঁরা অবলীলাক্রমে সঙ্গত করে যেতেন। [১৮]

লহরী দেববর্মার 'নাদপীঠ' ও পুলিন দেববর্মার 'বীরবিক্রম সঙ্গীত বিদ্যালয়' এই দুইটি সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র বহু ছাত্রছাত্রী তৈরি করেছে। পুলিন দেববর্মাকে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যই বৃত্তি দিয়ে সঙ্গীতে তালিম নিতে লক্ষ্ণৌ পাঠিয়েছিলেন। পুলিন দেববর্মা ঐ সময়ে লক্ষ্ণৌ-এর মরিস কলেজে রতন ঝংকার, আগা খাঁ প্রমুখ রঙ্গিলা ঘরানার ওস্তাদদের কাছে তালিম নেন এবং শিক্ষান্তে এসে আগরতলায় 'বীরবিক্রম সঙ্গীত বিদ্যালয়' নামে একটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান শুরু করেন। ১৯৫১ সালে পুলিন দেববর্মার তৈরি

এই বিদ্যালয় 'কলেজ অব মিউজিক এণ্ড ফাইন আর্টস' নামে উমাকান্ত একাডিমির পশ্চিমদিকে লাল দালান ও টিনের ঘরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৭ সালে কলেজটি 'ভাতখণ্ড সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ'-এর অনুমোদন পায়। ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি কেন্দ্রীয় সরকারের এক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন কেন্দ্র সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবীর আগরতলার উমাকান্ত একাডেমির মিলনায়তনে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে ১৯৬১ সালে সারা ভারতব্যাপী রবীন্দ্রজন্ম শতবর্ষ পালন করার অঙ্গ হিসেবে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যে রবীন্দ্র বিষয়ক চর্চার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান ও একটি মিলনায়তন করা হবে যাতে সাধারণ মানুষ রবীন্দ্রচর্চা ও গবেষণা করার সুযোগ পায়। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন ত্রিপুরা সরকারের চীফ কমিশনার কে. কে হাজরা ও শিক্ষাসচিব নারায়ণ চ্যাটার্জির উদ্যোগে শচীনকর্তার বাড়িতে তৈরি হল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন এবং যোগেন ক্যাপ্টেন নামক এক ব্যক্তির তৈরি বাড়ি কিনে ওই বাড়িতে পুলিন দেববর্মার তৈরি প্রতিষ্ঠনটিকে 'সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়' নামে ১৯৬৪ সালে সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। কুমুদ ব্যানার্জি ছিলেন এই কলেজের নবনিযুক্ত প্রথম অধ্যক্ষ, অধ্যক্ষের অবর্তমানে সিনিয়র লেকচারার পুলিন দেববর্মাই কলেজটির যাবতীয় দেখাশুনা করতেন। পরবর্তী অধ্যক্ষরা ছিলেন পি.এন. ভার্বে, ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক, ড. পদ্মিনী চক্রবর্তী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) প্রমুখ এবং এখানে যারা শিক্ষকতা করেছেন তাঁদের মধ্যে লহরী দেববর্মা, নৃপেন্দ্রচন্দ্র দে, অঙ্গন তন্বী সিংহ, বিহারী সিংহ, সাধন ভট্টাচার্য, আরতী কর, নারায়ণ দেববর্মণ, পিনাকপাণি গুপ্ত, তাপসী দত্ত, কনিকা দেববর্মণ, ঝর্ণা দেববর্মণ, অনন্ত দেববর্মা, হীরণ দেববর্মা, গনেশ দেববর্মা, অনাথবন্ধু দেববর্মা, উৎপলকৃষ্ণ দেববর্মা, রতন সেনগুপ্ত প্রমুখ। ১৯৭৬ সাল থেকে এই মহাবিদ্যালয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েশন পেয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন শাখায় স্নাতকস্তরের পড়াশোনা শুরু করে এবং বর্তমানে এটি একটি ইউ. জি. সি-এর অনুমোদিত ত্রিপুরা কেন্দ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি সঙ্গীত কলেজ যেখানে ২০০২ সাল থেকে কণ্ঠসঙ্গীত (শাস্ত্রীয়), রবীন্দ্র সঙ্গীত, তবলা, সেতার, সরোদ, ও নৃত্য (ভারতনাট্যম, কথক, মণিপুরী) প্রভৃতি বিষয়ে অনার্স সহ স্নাতক স্তরে পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে সরকার কর্তৃক পরিচালিত মহাবিদ্যালয়টি পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে সঙ্গীত সরস্বতীর সেবায় নিরলস ভূমিকা পালন করে চলছে। বিগত এই বছরগুলিতে

এখান থেকে প্রচুর ছাত্রছাত্রী তৈরি হয়েছে, যারা নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শিল্পী হিসেবে এবং গুরু হিসেবে নিজস্ব ভুমিকা পালন করেছে। বর্তমানে এই মহাবিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর কণ্ঠসঙ্গীত ও কথক বিভাগে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সম্ভবত ১৯৬৪ সাল থেকেই 'ত্রিপুরা মিউজিক এণ্ড কালচারাল ইনষ্টিটিউট' নামক একটি সঙ্গীত শিক্ষার সংস্থা করেছিলেন ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক এবং সন্তুর বাদক দুলাল রায়। এখানে বারীন্দ্র দেববর্মা, নরেন্দ্র দেববর্মা, সুরেশ তালুকদার প্রমুখরা সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন, নাচ শেখাতেন গৌরহরি সিংহ, সেতার শেখাতেন কিশোরকুমার সিংহ, নব্বই-এর দশক পর্যন্ত এই সংস্থা থেকে বহু ছাত্রছাত্রী তৈরি হয়েছে। তন্মাধ্যে অশোক দাস, সুবল বিশ্বাস, ভানু দে, হীরেন্দ্রনাথ কর, বিজয় দাসগুপ্ত, বিমল সেনগুপ্ত, রবীন্দ্র দাস, কুমুদ সরকার, চিত্তরঞ্জন আঢ্য, স্বপন সেনগুপ্ত, ননীগোপাল চক্রবর্তী, বাক্‌দেবী সেন প্রমুখ।

নৃত্যের ক্ষেত্রে মণিপুরী নৃত্যচর্চা এখানকার এক গৌরবময় ঐতিহ্য। কিভাবে মণিপুর থেকে এই নৃত্য এসে পল্লবিত হল এবং রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে সেটা বিশ্বভারতীতে শিক্ষার বিষয় হয়ে ভারতের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ল সে বিষয়ে একটা ধারণা দেওয়া আবশ্যক বলে মনে করছি। ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের ইতিহাস *রাজমালা* গ্রন্থ অনুসারে ১৭৫তম রাজা রাজধর মাণিক্য যখন মণিপুররাজ পামহৈবার পৌত্রী, ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহের কন্যা হরিসেশ্বরীকে বিয়ে করেন সেই মণিপুর দুহিতার রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ থেকেই ত্রিপুরার রাজবাড়িতে মণিপুরী সংস্কৃতির প্রভাব পড়তে থাকে। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে রাজধর মাণিক্যের পৌত্র কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য মণিপুররাজ মার্জিত সিংহের তিনকন্যা চন্দ্রকলা, অখিলেশ্বরী ও বিধুবালাকে বিয়ে করেন। এই সময়ে ব্যাপকভাবে প্রচুর সংখ্যক মণিপুরীদের ত্রিপুরায় আগমন ঘটে। ফলে প্রাসাদের অভ্যন্তরে এবং প্রাসাদের বাইরেও গড়ে উঠতে থাকে মণিপুরী নৃত্যচর্চার পরিমণ্ডল। ১৮৫০ সালের কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের পুত্র মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য শ্রীহট্ট থেকে আগত খোলবাদক বাবু মৈরাংখেম-বাবুনির বোন জাতিশ্বরীকে বিয়ে করেন, তাঁদের পুত্রই নবদ্বীপচন্দ্র বাহাদুর যিনি সুরসম্রাট কুমার শচীন দেববর্মণের পিতা। ঈশানচন্দ্র মানিক্যের অনুজ মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যও বিবাহ করেন মণিপুর রাজকন্যা ভানুমতী

দেবীকে। এইভাবে বৈবাহিক সূত্রে মণিপুরের বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব যেমন ত্রিপুরার রাজবাড়িতে পড়েছে তেমনি সূত্রপাত হয়েছে মণিপুরী নৃত্যচর্চারও। তবে এই নৃত্যচর্চা বহুল ভাবে প্রচলিত হয় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমল থেকে, তখন থেকে মহিলারাও এতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। তখন মণিপুরী মহারাস, বসন্তরাস, কুঞ্জরাস, ঝুলন নৃত্য প্রভৃতি ছাড়াও রাসযাত্রা উপলক্ষে 'খুপাইসে' নামক নৃত্য অনুষ্ঠিত হত। এতে খুপা-করতাল, ইসে-করতালি সহযোগে গান করে বৃত্তাকার ঘুরে ঘুরে মেয়েরাই নৃত্য করত। বসন্ত সিং ছিলেন ত্রিপুরার রাজ পরিবারের নৃত্যগুরু। অন্দরমহলের রাজকন্যারা তাঁর কাছে মণিপুরী নৃত্যশিক্ষা করতেন। রাজপরিবারের অন্তত ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন মেয়ে বসন্তরাসে যোগ দিত। ঝুলন অনুষ্ঠানের শেষ দিন শ্রাবণী পূর্ণিমায় মহারাস নৃত্য সারারাত ধরে চলত। ত্রিপুরাতে স্থানিক প্রভাবে মণিপুরী নৃত্যের পোশাকে যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমনি এতে কমনীয়তার পাশাপাশি কিছুটা উদ্দামতা এসেছে বলেও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। শেষবার আগরতলায় এসে ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মার (লালুকর্তা) বাড়িতে মহারাস নৃত্য দেখার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সত্যরঞ্জন বসু 'ত্রিপুরার রবীন্দ্রস্মৃতি' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—

...সন্ধ্যায় মহারাজকুমার এর বাড়িতে কবি রাসনৃত্য উপভোগ করেন। ব্রজেন্দ্রকিশোরের বাড়ির মেয়েরা রবীন্দ্রনাথকে দেখাবার জন্য কিছুদিন যাবৎ রাসনৃত্য তালিম দিতেছিলেন। দিব্যশ্রী সৌষ্ঠবমণ্ডিতা বালিকাদের নৃত্যসজ্জা বিশেষভাবে পুষ্পাবরণ সজ্জা অপূর্ব। দীর্ঘ তাল-লয় যোগে মৃদঙ্গ ও মন্দিরার তালে তালে তাহাদের পদসঞ্চালন—লীলায়িত দেহলতিকায়ে নানমুদ্রার অঙ্গুলিবিন্যাস—মৃদুমধুর সুললিত কণ্ঠে অপূর্ব
সঙ্গীতে পুষ্পপত্র শোভিত রাসমণ্ডপে এক অপরূপ শোভার সমাবেশ কবি মুগ্ধনেত্রে যেন বৃন্দাবনের অভিসারিনীদেরই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'ইহা দেখায় আমার পূর্ববঙ্গে আসা সার্থক হল'— ...এই কথাই তখন কবির মুখে এসেছিল। [১৯]

এই নাচকে প্রাসাদের বাইরে এনে সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার দায়িত্ব পালন করেছিলেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নৃত্যগুরুরা আর বিশ্বের সমক্ষে তুলে ধরেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আমরা জানি যে ১৯১৯ সালে মণিপুরী নৃত্যের উৎকর্ষতা দেখে রবীন্দ্রনাথ বীরেন্দ্রকিশোরকে অনুরোধ করেন নৃত্যশিক্ষক পাঠানোর জন্য। বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য

১৯২৩ সালে বুদ্ধিমন্ত সিংহকে শান্তিনিকেতনে পাঠান মণিপুরী নৃত্যশিক্ষক হিসেবে।

এরপর থেকে একে একে বুদ্ধিমন্ত সিংহ, নবকুমার সিংহ, কুমুদ সিংহ, বসন্ত সিংহ, রাজকুমার চন্দ্রজিৎ সিংহ প্রমুখ শান্তিনিকেতনে নৃত্যশিক্ষা দিতে গেছেন। এঁদের মধ্যে নবকুমার সিংহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ শান্তিনিকেতনে নৃত্যনাট্যগুলির তৈরিতে প্রধান রূপকার হিসেবে অভিনবত্ব সৃষ্টিতে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরবর্তী সময়ে মণিপুরী নৃত্যকলা রাজধানী আগরতলায় অবস্থিত ত্রিপুরা সঙ্গীত সরকারী মহাবিদ্যালয়-এ বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজকুমার সুরেন্দ্রজিৎ সিংহ দীর্ঘদিন এই মহাবিদ্যালয়ে এবং রাজকুমার চন্দ্রজিৎ সিংহ মহারানি তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে এই নৃত্যকলা শিক্ষা দিয়ে প্রচুর ছাত্রছাত্রী তৈরি করেছিলেন। এছাড়াও এই নৃত্যশিক্ষা প্রচলনে সরকারী সঙ্গীত মহাদ্যিালয়ে গুরু অনঙ্গথৈমী সিং, গুরু বিহারী সিং, রমেশ দত্ত, কুঞ্জেশ্বর দত্ত, গুরু বীর সিং, মণি সিং এঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বর্তমানে শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়-এ মণিপুরী নৃত্যে স্নাতক (সান্মানিক) ডিগ্রি করার সুযোগ রয়েছে।

এখানকার সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল হোলিসঙ্গীত। ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গীত ও সাহিত্যে হোলি উৎসবের অবদান রয়েছে। মহারাজা বীরচন্দ্রের আমলে রাজ্যের প্রজারা সবাই হোলি উৎসবে যোগদান করতেন। বীরচন্দ্রের লিখিত হোলিগান *লালে লাল আজি কাল তনু, বৈরী নারী শত একলা কানু* এবং বীরচন্দ্রের সভাকবি মদনমোহন মিত্রের রচিত হোলি গান 'রাঙা ধুলি ব্রজের পথে কিবা রাঙা ধুলি' তখন ত্রিপুরাবাসীর সবার মুখে মুখে ফিরত। মহারাজ বীরচন্দ্র, 'হোরী', বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য রচিত 'দোললীলা' নাটিকা এবং বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের লেখা 'হোলি' সঙ্গীত পুস্তকগুলি সেই পুরনো দিনের স্মৃতি বহন করে। রাজঅন্তঃপুরের হোলি দলগুলির ইতিহাস যদিও আজ বিস্মৃতপ্রায়। জানা যায় ১৯২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দে 'গোলাপী গোলাপ' ও কনকচাপা' হোলি নাট্যসঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 'গোলাপী গোলাপ '-এর পরিচালনায় ছিলেন কুমারী বিভাস প্রভা দেবী যিনি পরবর্তী কালে বারিয়ার রাজ্যের রাজমাতা হয়েছিলেন। 'কনকচাঁপা' গীতিনাট্যের পরিচালনায় ছিলেন মহারাজকুমারী উজ্জ্বলা দেবী। তিনি ছিলেন মন্ত্রী বোধজং বাহাদুরের ছোটোরানি। দুইটি গীতিনাট্যের সুর সংযোজন করেছিলেন মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর

মাণিক্য। এমনিভাবে ১৯৩০ সালে 'কোহেলি' ও 'পাপিয়া' নামে হোলি সঙ্গীত পরিচালিত হয়েছিল কুমার বলীন্দ্র দেববর্মণের সহায়তায় এবং ১৯৪৭ সালে 'দোলপূর্ণিমা' হোলিসঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন রানি সাহেবা হিমানী দেববর্মণ। ১৯৪৮ সালে 'ফাগুয়া' হোলিসঙ্গীত পরিচালিত হয়েছিল মহারাজকুমারী সুচারু দেবী এবং ১৯৫০ সালে আবার হিমানী দেবীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'বসন্ত সমাগমে' নামক হোলিগীতিকা। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে মহারাজকুমারী ইলা দেবী পরিবেশন করেছিলেন 'হিন্দোলা' হোলিগীতি। 'কাকলি' ও 'হিন্দোলা' নামক হোলিগীতির রচনা করেছিলেন কুমিল্লার অজয় ভট্টাচার্য। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে 'ত্রিপুরার ফাগুয়া সম্মিলনী' নামে একটি হোলির দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তী সময় নবাগতরাও হোলি উৎসবকে স্বাগত জানিয়ে নিজেরা অংশগ্রহণ করতে লাগল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তরুণদের দ্বারা 'সুভাষ তরুণ সংঘ' স্থাপিত হয়। এই দলের সঙ্গীত রচয়িতা ও পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন অমল চক্রবর্তী, প্রিয়রঞ্জন দাস, আমিনুল ইসলাম, কিরণ দেববর্মণ, অমলেন্দু মজুমদার প্রমুখ। উজীর বাড়িতে 'অনিল সঙ্গীত বিদ্যালয়'-এর ছাত্রছাত্রীরা প্রতি বছর হোলি সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করত। ত্রিপুরার হোলি সঙ্গীত রচয়িতা জীবেশ দেববর্মণের নাম করতে হয় যিনি ১৯৬৫ থেকে শুরু করে আজীবন হোলিসঙ্গীত রচনা করে গেছেন।

একটা সময় সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে রাজ আমলে বাণী সঙ্গীত রচনা হত। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর ও বীরবিক্রম কিশোর-এর আমলে সরস্বতী পুজোর পরের দিন তাঁরা ছাত্রদের বনভোজনের নিমন্ত্রণ করতেন। সেই সময় ছাত্ররা বাণী সঙ্গীত পরিবেশন করত। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে বিজয়কুমার স্কুলের ছাত্ররা শিক্ষক প্রফুল্ল ভট্টাচার্যের রচিত *এস মা ভারতী, এসো মা দেবী* গানটি করেছিল, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুর বোর্ডিং, ত্রিপুরা বোর্ডিং সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রশান্ত ভট্টাচার্যের রচিত *এসো মা ভারতী বাণী/হৃদয়সরোজে বিছায়ে রেখেছে/কোমল আসনখানি* গানটি করেছিল। কিরণ দেববর্মা ও মহেন্দ্র দেববর্মার সুর সংযোজনায় বাণী-বন্দনার গানগুলি সেদিন সমধিক জনপ্রিয় ছিল। এখন আর বাণী বন্দনায় সঙ্গীত রচিত হয় না।

এবার আসা যাক লোকসঙ্গীতের কথায়। ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসঙ্গীতের ধারা দুইটি। একদিকে ত্রিপুরার মহারাজারা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাকে রাজভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

অপরদিকে উপজাতিদের নিজস্ব কক্‌বরক ভাষা বিদ্যমান থাকায় ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসঙ্গীত এই দুই ভাষায় রচিত হয়েছে। অন্যান্য উপজাতিদের পাশাপাশি উল্লেখ্য যে কুকিদেরও নিজস্ব কিছু লোকসঙ্গীত কুকি ভাষায় রয়েছে। বীরচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পর কুকিরাজা বানখুম্পুই রাজাকে উদ্দেশ্য করে একটি সঙ্গীত লিখেছিলেন। এছাড়াও জারি, মুর্শিদা, বাউল, ধামাইল, দেহতত্ত্ব, ভাটিয়ালি, লালনের গান, হাছন রাজার গান, রাধারমণের গান, পদাবলী কীর্তন প্রভৃতি প্রায় সব ধরনের গানই গাওয়া হয়। আধুনিক গান, পুরাতনী সবই গাওয়া হত এবং হয়। লোকগায়কদের মধ্যে— আড়ালিয়া গ্রামে মুর্শিদি গান করত হায়ারাত জামন, জয়নাল আবেদিন। ইন্দ্রনগরে ছিল ঝুনকো শেখ, গজারিয়ায় আব্দুল বারি। ত্রিপুরার বাউলদের মধ্যে রমেশ বাউল, অনুকূল দাস, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখের নাম করা যায়। ত্রিপুরার লোকগায়ক বৈকুণ্ঠ দাস বহু লোকসঙ্গীত রচনা করেছিলেন।

বিচিত্র তাল ও রাগ সম্বলিত ত্রিপুরা রাজ্যের কীর্তন সেই সময়ে একটি আলাদা মাত্রা পেয়েছিল। কীর্তন গাইয়ে হিসেবে কুমার নরেন্দ্র ঠাকুর, বসন্ত ঠাকুর, কালাচান দেববর্মণ, ভুবন ঠাকুর, বলাই চাঁদ গোস্বামী ও মুইন্যা ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। বৃহত্তর ত্রিপুরার অন্তর্গত সর্বানন্দ ঠাকুর নামে একজন কালীভক্ত সাধক ছিলেন। তাঁর বহু গান সেই সময়ে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আরেকজন সাধক হলেন মির্জা হোসেন যিনি ঢাকার লোক হলেও তাঁর জমিদারি ত্রিপুরা জেলায় থাকার কারণে তিনি ত্রিপুরাতেই বাস করতেন। তাঁর রচিত মালসি গানও সেই যুগে বৃহত্তর ত্রিপুরায় জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এছাড়া মালসি গানের ক্ষেত্রে দেওয়ান রামদুলাল ও রামকুমার পত্রনবীসের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। ১২৩৯ বঙ্গাব্দের কাছাকাছি সময়ে ত্রিপুরার দেওয়ান বৃহত্তর ত্রিপুরার ত্রিপুরা জেলা বর্তমানে কুমিল্লা জেলার কালিকচ্ছ গ্রমের শক্তিউপাসক রামদুলাল নন্দীর পুত্র আনন্দ চন্দ্র নন্দী বা আনন্দস্বামী 'দয়াময়' নামে নতুন ধর্মের প্রচার করেছিলেন। এই 'দয়াময়' সাধনতত্ত্বকে ভিত্তি করে তিনি প্রচুর সঙ্গীত রচনা করেছিলেন যা ত্রিপুরার লোকমানসে প্রচলিত ছিল। ওই সময়েই (১৮৮০-৯০ খ্রিঃ) বৃহত্তর ত্রিপুরার জেঠাগ্রাম নিবাসী রক্ষাকর ভট্টাচার্য তিনখণ্ডে *সঙ্গীত সার* গ্রন্থ, চুন্টা নিবাসী ভারতচন্দ্র চক্রবর্তী *ভারতসঙ্গত* (১৮৯৭ খ্রিঃ), রামকানাই দত্ত *স্বদেশী সঙ্গীত*, *সেবক সঙ্গীত* প্রভৃতি সঙ্গীতের পুস্তক রচনা করে ত্রিপুরার সঙ্গীত ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ

করেছিলেন।

রাজ আমল থেকেই ত্রিপুরায় রবীন্দ্রচর্চার সূত্রপাত হয়। মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর কবিগুরুর সপ্ততিতম জন্মদিনে কলকাতার টাউন হলে রবীন্দ্রশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন আর তাঁর আশিতম জন্মদিন যে ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদে মহাধূমধামে পালিত হয়েছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে রবীন্দ্র চর্চার ধারাকে আরো জোরালো করেছিলেন ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনী, কিশোর সাহিত্য সমাজ, রবি পত্রিকা এবং উজ্জয়ন্ত নাট্যচর্চা কেন্দ্র প্রভৃতির মাধ্যমে। জানা যায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্যবাসর আয়োজিত রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে সভাপতিত্ব করেছিলেন ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ। স্বাধীনতার পর এম.বি.বি. কলেজে কয়েকজন রবীন্দ্রানুরাগী অধ্যাপক যোগ দিয়েছিলেন যারা রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৬০ সালের ১৩ মে উমাকান্ত একাডেমিতে আয়োজিত আচার্য নরেন্দ্র ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেছিলেন। ১৯৬১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর অশ্বিনী আঢ্য, নেপাল দে, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, ব্রজগোপাল রায়, রাখাল চক্রবর্তী, সুকোমল ধরচৌধুরী, ধীরাজমোহন চৌধুরী বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য এবং অমিয় মুকুল দে-র উদ্যোগে ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদকে কেন্দ্র করে এখানকার রবীন্দ্রানুরাগী ব্যক্তিবর্গ নানাধরনের কর্মসূচি পালনের নধ্য দিয়ে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্রমাগত ত্রিপুরার রবীন্দ্রচর্চার পরিমণ্ডলকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলেছেন। কবিগুরু সার্ধশতবর্ষে রাজ্য সরকার সারা বছর ধরে বহু কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। সরকারী প্রচেষ্টা ছাড়াও বেসরকারি উদ্যোগে বহু সংস্থার মাধ্যমে ত্রিপুরার রবীন্দ্রচর্চার পরিমণ্ডল ক্রমশ বেড়েই চলেছে। রমাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের *শতাব্দীর ত্রিপুরা*-র গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে সেই যুগে ত্রিপুরা রাজ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম প্রচলন করেছিলেন উমাকান্ত একাডেমির প্রধান শিক্ষক ভূপন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথের *কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, বেলা হল মরি লাজে, আগুন জ্বালো, বসন্তে ফুল গাঁথলো আমার জয়ের মালা* প্রভৃতি গানগুলো তখনকার শিল্পীরা গাইতেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতে নরেন্দ্র দেববর্মণ, সমীর দাস, অমিয়মুকুল দে, সত্যব্রত ভট্টাচার্য, অসীমা ভট্টাচার্য, তিথি দেববর্মণ, সুব্রত দেবনাথ, দেবাশিস বর্ধনরায়, দেবাশিস এন্দ, শুক্লা ভট্টাচার্য,

মিলি সাহা, সেবিকা পাল, মধুছন্দা শুর, গৌর দাস, আরো বহু গুণী শিল্পীরা ত্রিপুরায় রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

আধুনিক বাংলা গানে সর্বপ্রথম কৃষ্ণজিৎ দেবর্মণের নাম করতে হয়, তিনি প্রথম জীবনে শচীনকর্তার নিকট ভাটিয়ালি গান এবং পরে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শাস্ত্রীয় তালিম নিয়েছিলেন। তাঁর রচিত সঙ্গীত গ্রন্থ *তব স্মরণ খানি* ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম দিককার আধুনিক সঙ্গীত পুস্তক। তাঁর কিছু পরেই নাম করতে হয় অমল দেববর্মণের। তিনি ত্রিপুরার সঙ্গীত জগতে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কলিকাতা ও ঢাকা বেতারকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত এই শিল্পীর সেই সময় কলম্বিয়া ও রিগেল গ্রামাফোন কোম্পানি থেকে চারটি রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল। অমল দেববর্মণের অকালমৃত্যুতে ত্রিপুরার সঙ্গীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। তাঁদের সমসাময়িক বা কৃষ্ণজিৎ দেববর্মার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভা সেন, ভূপেন ব্যানার্জি, আরতি কর, হীরণ দেববর্মা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। সুরকার হিসেবে হীরেন্দ্র দেববর্মণ ও ধবল দেববর্মণের নাম উল্লেখ্য।

রাজ্যের সঙ্গীতচর্চার একটি কেন্দ্র যেমন রাজদরবার ছিল তেমনি আরেকটি কেন্দ্র ছিল বৃহত্তর ত্রিপুরার ত্রিপুরা জেলা। সেই জেলা ত্রিপুরার সঙ্গীতের কথা বলতে গেলে প্রথমেই নাম করতে হয় ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের, যার কথা রাজদরবারের কেন্দ্রিক আলোচনায় এসেছে। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ এবং তাঁর আরো দুই ভাই আফতাবউদ্দীন ও আয়েত আলি খাঁ শ্রীরামপুরের ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁর কাছে প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। আফতাবউদ্দীন খাঁ ছিলেন বিখ্যাত বাঁশীবাদক। পরে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে চলে যান এবং কালীভক্ত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। আফতাবউদ্দীন, মাতাপুরা গ্রামের মনমোহন দত্ত এবং উজানচরের লব পাল এই তিনজনে মিলে 'মলয়া' নামে একটি সঙ্গীত পুস্তক রচনা করেছিলেন। 'মলয়া'-র গান আজও আউল, বাউল ফকির, দরবেশরা একতারা, দোতারা সহযোগে গাইতে পছন্দ করেন। আয়াত আলি খাঁ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় 'আলম ব্রাদার্স' নাম দিয়ে একটি বাদ্যযন্ত্রের দোকান করেছিলেন। তাঁর তৈরি যন্ত্র 'চন্দ্রসারব' সে সময় উচ্চ প্রশংশিত হয়েছিল। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রজন্ম শতবর্ষ পুর্তির সময়ে বিশ্বভারতী থেকে দেশিকোত্তম উপাধি, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে

ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি আগরতলায় বহুবার এসেছিলেন। বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের সময়কাল থেকে শুরু করে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে 'সারা ত্রিপুরা যুব সম্মেলন' পর্যন্ত তিনি শেষবারের মতো আগরতলা আসেন। পৃথিবী বিখ্যাত এই সরোদ শিল্পীর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর মাইহার-এ নিজভবনে মৃত্যু ঘটে।

ত্রিপুরা জেলার সর্বত্র যে সুর ছড়িয়ে পড়েছিল তার কেন্দ্র ছিল কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া। খুরসিদ (খসু মিঞা) সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, কুমার শচীন দেববর্মণ, জ্ঞান দত্ত প্রমুখেরা কুমিল্লায় সঙ্গীত চর্চা করতেন। তাঁদের সমসাময়িক ছিলেন গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য। তিনি সুরসাগর হিমাংশু দত্তের অনুরোধে গান লিখতে শুরু করেছিলেন। সেই গানে সুর দিতে থাকলেন অন্যরা। শচীন দেববর্মণের অধিকাংশ গানের গীতিকার এই অজয় ভট্টাচার্য। সেই সময় কুমিল্লায় দুটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান ছিল। একটি 'বাণী বিতান' অন্যটি 'সঙ্গীত শিক্ষা সম্মেলন' পরে আরো একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান হয় যার নাম 'সুরলোক'। কুমিল্লার আরেকজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন শৈলেন চক্রবর্তী, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা বেঙ্গল প্রেস থেকে যোগব্রত গুপ্ত কর্তৃক শৈলেন চক্রবর্তীর সঙ্গীতগ্রন্থ *গীতিগুচ্ছ* প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যান্য শিল্পীরা ছিলেন ওস্তাদ সমরেন্দ্র পাল, সুরেন দাস, সুধীন দাস, সুখেন্দ্র চক্রবর্তী, রাখাল দাস, কেষ্ট দাস, নীহার দাস, শৈল দেবী, আলোক পাল, কল্যাণী রায়চৌধুরী, রমা পাল, নমিতা রায় এবং সরোজিনী দেবী। সরোজিনী দেবী ছিলেন স্বভাবকবি ও গীতিকার। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা থেকে তাঁর সঙ্গীত পুস্তক *সুরের বীণ* প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি আলাউদ্দীন খাঁর ছাত্রী ছিলেন। চাঁদপুরের চালিয়াতলি গ্রামের গোরাচাঁদ ঘোষাল ছিলেন লোকগায়ক। তাঁর রচিত *চাঁদপুরের গান* নামে একটি সঙ্গীত গ্রন্থ আছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অমর পাল বর্তমানে বেতার জগতের শিল্পী, তিনি আয়াত আলির খাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন।

আগেই বলা হয়েছে যে মিশ্রসংস্কৃতির রাজ্য ত্রিপুরা। এখানে একটা বড়ো অংশ রয়েছে উপজাতি জনগোষ্ঠির মানুষ। তাঁদের সঙ্গীত চর্চার কথা না জানলে এখানকার সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারনা পাওয়া সম্ভব নয়। খুবই সংক্ষেপে তার একটা রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে মোট উনিশটি তপসিলিভুক্ত উপজাতি জনগোষ্ঠী রয়েছে তাঁরা হলেন— ত্রিপুরী, জমাতিয়া, রিয়াং, নোয়াতিয়া, লুসাই, মগ, চাকমা, কুকি,

উচই, লেপচা, সাঁওতাল, খাসিয়া, কেইমল, ভুটিয়া, মুণ্ডা, ওরাং, গারো, ভিল প্রভৃতি। এই উপজাতিদের মধ্যে ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, হালাম, কুকি, মগ, চাকমা এরা সকলেই ত্রিপুরার প্রাচীন আদিবাসী। গারো, উচই, খাসিয়া ছাড়া অন্যান্য উপজাতিরা চা-বাগানের শ্রমিক হিসেবে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে ত্রিপুরায় এসে বসতি স্থাপন করেছেন। উপজাতি জনগোষ্ঠীদের ত্রিপুরীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষাগত ও রীতিনীতির পার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন উপভাষা থাকলেও উপজাতি জনগোষ্ঠীর 'ককবরক' ভাষা রাজ্যে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। উপজাতি সম্প্রদায়ের অধিকাংশ হিন্দু ধর্মবলম্বী হলেও তাঁদের নিজস্ব কৌলিক দেবদেবী রয়েছেন। সনাতন হিন্দু ধর্মের সঙ্গে তাঁদের নিজস্ব পূজা পদ্ধতিও প্রচলিত। চাকমা, মগ উপজাতিরা বেশিরভাগ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং লুসাই, কুকি ও গারো জনগোষ্ঠীর লোকেরা খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। এই বিরাট অংশের উপজাতি জনগোষ্ঠরা নানাধরনের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবকে কেন্দ্র করে নানাধরনের নাচ-গান করে থাকে। গড়িয়া পূজা ত্রিপুরীদের প্রধান পূজা। গড়িয়া দেবতার পূজাকে কেন্দ্র করে তারা নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান করে। রিয়াংদের প্রধান পূজা হল কের পূজা, এছাড়াও রয়েছে গঙ্গা পূজা, চিত্রগুপ্ত পূজা, মাতঙ্গী পূজা, তুইমা সংগ্রমা, বুরাছা, খুলুংমা, মাইলুমাও লাম্প্রা পূজা। গারো সমাজের নৃত্য হল গাননৃত্য, রণনৃত্য, দোক্রোসোয়া নৃত্য, আমবারে রুরুয়া নৃত্য, কিলপুরা নৃত্য। চের বা বাঁশনৃত্য লুসাইদের প্রসিদ্ধ লোকনৃত্য। হৈ-হক নৃত্য হালাম গোষ্ঠীর প্রধান নৃত্য। মুণ্ডাদের ঝুমুর নৃত্য, সাঁওতালদের সাঁওতালি নৃত্য। ওরা ঝুমুর নৃত্য ও ফাল্গুন মাসে ফাগুয়া নৃত্য করে।

ত্রিপুরার উপজাতি ও লোকগীতি ও নৃত্যগুলি বেশিরভাগই বাস্তবধর্মী। গানের সুরের নাম সাধারণত এলাকা বা গোষ্ঠীর নাম যেমন— বেবী, দাসপা, লক্ষপতি, উতুরা, দক্ষিণ্য, দুনা, ত্রিপুরা যাবত, রিয়াং কলই নোয়াতিয়া প্রভৃতি বা সামজিক আচার বা কাজের নামে যেমন— চামরী, তুনমানী, কাবমা, হামজুক, রনবমানি, লংগয়, চকমানি, মশক ছুমানি ইত্যাদি বা কাজের নামে বা পরিবেশের নামে হয়ে থাকে। গড়িয়া নৃত্য হল গোষ্ঠীনৃত্য। ত্রিপুরী, কলই, রিয়াং, নোয়াতিয়া প্রভৃতি বেশিরভাগ সম্প্রদায়ই এই নৃত্য করে থাকে। বাইশ রকমের গড়িয়া নাচ হয়।

উপজাতীয় লোকসঙ্গীতের মধ্যে সাধারণত পাঁচটি সুর ব্যবহৃত হয়, তাল নেই বললেও চলে। গানের সঙ্গে যেসব বাদ্যযন্ত্র বাজে সেগুলি হল— সাইন্দা, সুমু, চমপ্রেং, মুরিসাংদু ইত্যাদি। যুবক যুবতির প্রেম বিষয়ক যে গানগুলি রয়েছে সেগুলির নাম যাদুকলিজাং রচাবমুং। উপজাতি সঙ্গীতের মধ্যে তাঁদের নিজস্ব চিন্তাধারা ও সামাজিক অবস্থার বহু চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত কাজের কথাই বেশি থাকে । যেমন— সুতা কাটা, কাপড় বোনা, তুলা সংগ্রহ, হরিণ শিকার, মাছ ধরা, নবান্ন খাওয়া, গড়িয়া পূজা, বা শোক প্রকাশ ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে জনপ্রিয় 'রেসিয়ার খাগরা' বা যুদ্ধ সঙ্গীত। এটি স্বামী যখন যুদ্ধে যায় স্ত্রী-র বিরহজনিত শোকের গান। জুমকেন্দ্রিক নানাপ্রকার সঙ্গীতে রয়েছে পাহাড়ি নরনারীর হৃদয়ের প্রেম ভালোবাসা ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার কথা। জুম সঙ্গীত কর্মসঙ্গীত হলেও এতে রয়েছে রোমান্টিকতা। বিভিন্ন উপজাতিদের কর্মসঙ্গীত ও প্রেমসঙ্গীতে নানাধরনের বৈচিত্র্য রয়েছে। উপজাতি নৃত্যগীত সম্পর্কে আরো নানাধরনের তথ্য স্বল্পপরিসরে দেওয়া সম্ভব হল না তবে এইটুকু বলা যায় যে তারা খুবই আমোদপ্রিয়, সারাবছরই তারা নৃত্যগীত-এর অনুষ্ঠান করে থাকে। বর্তমানকালে পাহাড়ে টেলিভিশন সংস্কৃতি, অর্কেষ্ট্রা ইত্যাদিও খুব হয় যেখানে বাংলা, হিন্দি নানাধরনের ছায়াছবির সঙ্গীত ও নৃত্যাদির চর্চাও করা হয়। বর্তমানে এ ডি সি এলাকায় 'খুমলুং' ও একটি ফোক মিউজিক কলেজ গড়ে উঠেছে, যেখানে উনিশটি উপজাতীর সঙ্গীত ও নৃত্যচর্চা করা হয়। এবং প্রাচীন সঙ্গীতগুলিকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ করা হয়। 'ফোকসঙ্গীত', 'ফোকনৃত্য' ও তালবাদ্য 'খাম'-এর ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি করার সুযোগ রয়েছে, সেখানে ফোক-সংস্কৃতির পাশাপাশি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও নৃত্য, তবলা ইত্যাদি বিষয়ও ইলেকটিভ সাবজেক্ট হিসেবে পড়ানো হয়। আগরতলার সুপারীবাগানেও এইরকম একটি কলেজ খোলা হয়েছে, সেখানে উপজাতিদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বহুলচর্চার মধ্যে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। রিয়াংদের হজাগিরি নৃত্য তো এখন পুরো বিশ্বের কাছে সমাদৃত।

ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে দেখা যায় অতীতের রাজন্য কৃষ্টিসংস্কৃতিই স্বাধীনতা-উত্তর গণতান্ত্রিক ত্রিপুরার কৃষ্টিসংস্কৃতির মূল ভিত। এই ধারাই রাজতান্ত্রিক পরিবেশ থেকে গণতান্ত্রিক পরিবেশে প্রবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে চুলচের

বিভাজন টানা অনেকটাই অসম্ভব। যে সমস্ত গুণী শিল্পীগণ স্বাধীনোত্তর কাল থেকে আজ পর্যন্ত সঙ্গীতের এই ধারা বেয়ে ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধ করেছেন বিশেষ করে ধ্রুপদী সঙ্গীতে তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের নাম ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত যারা ছিলেন তাঁরা হলেন বারীন দেববর্মণ, রাজেন দাস, শশাঙ্কমোহন দেববর্মণ, হরিশঙ্কর দেববর্মণ, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, রাধাকান্ত বসাক। দৃষ্টিহীন শিল্পী সাধন ভট্টাচার্য, সত্যেন দাস, রবীন্দ্র দেববর্মণ, রঞ্জিৎ ঘোষ, কণিকা দেববর্মণ, ঝর্ণা দেববর্মণ, রতন সেনগুপ্ত, ননীগোপাল চক্রবর্তী, তাপসী দাস, মীনা দেববর্মণ, দীপ্তি চৌধুরী, পূর্ণিমা চক্রবর্তী, ড. মৃণাল চক্রবর্তী। উদয়পুরের প্রিয়লাল লস্কর, মানিক চক্রবর্তী, বিনয়ভূষণ দেব, ভানু ধর, গিরিন্দ্র চন্দ্র দেববর্মণ, অবনীমোহন সাহা, অখিল চক্রবর্তী এবং কৈলাশহরের অশ্বিনী শর্মা প্রমুখ।

যন্ত্রসঙ্গীতে হেমন্তকিশোর দেববর্মা, কালিকিংকর দেববর্মা, কিশোর কুমার সিংহ, অশোক দাস, সুবল বিশ্বাস, বিশ্বনাথ আচার্য (উদয়পুর), মণিমঞ্জরী চক্রবর্তী, তবলায় বীরেন রায়, মনোরঞ্জন দাস, মনোরঞ্জন দেব, পিনাকপাণি গুপ্ত, গোপাল বিশ্বাস, শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য, তিমির রায়চৌধুরী, রথীন্দ্রনাথ রায়, দেবাশীষ ভট্টাচার্য, হরেকৃষ্ণ রায়। নৃত্যে গুরু বিহারী সিংহ, ড. পদ্মিনী চক্রবর্তী, হীরা দে, সদ্যপ্রয়াত উমাশঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ।

রবি নাগ ত্রিপুরায় প্রতি মহকুমায় সঙ্গীত প্রচারের উদ্দেশে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজধানী আগরতলায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সঙ্গীত ভারতী' বিদ্যালয় থেকেও বহু ছাত্রছাত্রী তৈরি হয়েছে। তাঁর রচিত সঙ্গীতগ্রন্থ *সঙ্গীতাঞ্জলী* (১৯৬১), ও *তানগুচ্ছ* (১৯৬৫) বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তারকেশ্বর রায়, চিত্তরঞ্জন দেববর্মণ, পুলিন বিহারী দেববর্মণ তাঁরা রাজ্যের বাইরর গিয়ে সঙ্গীতচর্চা করে সুনাম অর্জন করেছেন।

ভাটিয়ালি ও পল্লী সঙ্গীতে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অমিয় দাস, অরুন্ধুতী হোম চৌধুরী, রণজয় চৌধুরী, নমিতা দাস, রীতা সিংহরায়, প্রদ্যোৎ সিংহরায়। আধুনিক ও অন্যান্য সঙ্গীতে শুভ্রা দাস, অসীম দেববর্মণ, দময়ন্ত দেববর্মণ।

সবশেষে বলা যায় পূর্বসুরীদের সঙ্গীতগুণীদের অনুসরণপূর্বক ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বহুকচর্চার ধারা এখন সমানতালেই অব্যাহত। বর্তমানে সরকারি উদ্যোগ ছাড়াও বহু বেসরকারি সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্রে সৃষ্টি হয়েছে। সেইসব কেন্দ্র থেকে প্রতিবছর বহু শিক্ষার্থী ভারতের

অনেক পরীক্ষা নিয়ামক সঙ্গীত সংস্থার অধীনে সঙ্গীত বিশারদ, সঙ্গীত প্রভাকর, সঙ্গীতভূষণ, সঙ্গীত বিভাকর, সঙ্গীত নিপুণ, প্রবীণ ইত্যাদি ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা নিচ্ছেন। গুরুশিষ্য পরম্পরা এবং ইনষ্টিটিউশান ভিত্তিক উভয় ক্ষেত্রেই শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত , যন্ত্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, আধুনিক গান, পুরাতনী, তবলা, এবং কথক, ভরতনাটাম, মণিপুরী, কুচিপুড়ি, ওডিশী প্রভৃতি নৃত্য বহুলভাবে চর্চিত হচ্ছে। রাজ্য সরকার এই জাতীয় চর্চাকে নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনকে নতুনভাবে করা হয়েছে, নজরুল কলাক্ষেত্র, সুকান্ত একাডেমি, মুক্তধারা, পুলিন দেববর্মা স্মৃতি অডিটোরিয়াম প্রভৃতি অনেক নতুন নতুন প্রেক্ষাগৃহ ও মিলনায়তন নির্মিত হয়েছে সারা রাজ্য জুড়ে এবং সেইসব প্রেক্ষাগৃহে অবিরত চর্চিত হচ্ছে নানাধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সারা বছরই নানাধরনের অনুষ্ঠানে বহিঃরাজ্যের বহু খ্যাতনামা শিল্পীগণ আগরতলায় এসে তাঁদের পারফর্মেন্স করে থাকেন। এ-বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি বহু উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। সরকারি উদ্যোগে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হচ্ছে। রাজ্য সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর ও শচীন দেববর্মণ সরকারি মহাবিদ্যালয় ছাড়াও সঙ্গীতচক্র, ত্রিপুরা স্টেট কলা একাডেমি, সুরও বাণী, শনিবাসরীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঘরোয়া সভা, শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স প্রশংসনীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

নবীন প্রজন্মের উঠতি শিল্পীদের মধ্যে জহর ব্যানার্জি, শ্যামল দেব, সুদীপ্ত শেখর মিশ্র, শক্তি চক্রবর্তী, পদ্ম মৌলেশ্বর আদিত্য, কাকলি দাস, ভজন চক্রবর্তী, সুশান্ত লোধ। সেতারে শুভঙ্কর ঘোষ, অভিজিৎ শর্মা, বাবুল দেবনাথ (বাঁশী), নৃত্যে চিন্ময় দাস, অজন্তা বর্ধন রায়, মানসী ঘোষ, সংহিতা ঘোষ, ববি চক্রবর্তী, সোমা দত্ত, বঙ্কিম সিন্‌হা, দেবব্রত দেববর্মা, সর্বাণী নন্দী, স্বপ্না সিন্‌হা, হেনা সিন্‌হা, পূর্ণশ্রী ঘোষ, অরুনাভ শর্মা, অঙ্কোর দেববর্মা (সরোদ), নারায়ণ মজুমদার, সুব্রত তালুকদার, নারায়ণ বিশ্বাস, চিরদ্বীপ গাঙ্গুলি, প্রসেনজিৎ নন্দী আরো অনেকেই রয়েছেন।

শচীনকর্তা তাঁর *সরগমের নিখাদ* গ্রন্থে বলেছেন—

ত্রিপুরা সম্বন্ধে এই প্রবাদ আছে যে, সেখানকার রাজা, রানি কুমার, কুমারী তেকে দাসদাসী পর্যন্ত সবাই গান গায়। গলায় সুর নেই গাইতে পারে না এমন কেউ নাকি এখানে জন্মায়

না। ত্রিপুরার ধানের ক্ষেতে চাষীরা গান গাইতে গাইতে চাষ করে, নদীর জলে মাঝিরা গানের টান না দিয়ে নৌকা চালাতে পারে না, জেলেরা গান গেয়ে মাছ ধরে, তাঁতীরা তাঁত বুনতে বুনতে আর মজুরেরা পরিশ্রম করতে করতে গান গায়।

সেখানকার লোকেদের গানের গলা ঈশ্বর প্রদত্ত। আমি সেই ত্রিপুরার মাটির মানুষ— তাই বোধহয় আমার জীবনটাও গান গেয়ে কেটে গেল। [২০]

শচীনকর্তার তাঁর জন্মভূমিকে নিয়ে এই মূল্যায়ন নেহাত কথার কথা নয়। তাঁর উদ্ধৃতিকে মাথায় রেখে বর্তমান প্রবন্ধকার মনে করে যে স্বল্প পরিসরে সঙ্গীতপ্রাণ এই পার্বতী ত্রিপুরার সঙ্গীতচর্চার দিগন্তকে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট সমস্ত সঙ্গীতগুণী বা শিল্পীদের নামকেও একযোগে হয়তো তুলে ধরা গেল না এবং সেজন্য প্রবন্ধকারের আক্ষেপ রইল।

তথ্যসূত্র ঃ

১) *পিনাকপাণি গুপ্ত : সঙ্গীতাচার্য পুলিন চন্দ্র দেববর্মণ স্মৃতির সরণি বেয়ে, ২০০৭, পৃ: ১৮*

২) *ওই : পৃ: ৭*

৩) *রমাপ্রসাদ দত্ত : শতাব্দীর ত্রিপুরা, ২০০৫, ত্রিপুরা দর্পণ, পৃ: ৫৯*

৪) *ওই : পৃ: ৫৯*

৫) *পিনাকপাণি গুপ্ত : সঙ্গীতাচার্য পুলিন চন্দ্র দেববর্মণ স্মৃতির সরণি বেয়ে, ২০০৭, পৃ: ১০*

৬) *ওই : পৃ:১৩*

৭) *ওই : পৃ:১১*

৮) *ওই : পৃ:*

৯) *পান্নালাল রায় : ভগ্নহৃদয়ের কবিকে রাজার অভিনন্দন, রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরা, পারুল প্রকাশনী, আগরতলা, পৃ: ৭*

১০) *ওই : পৃ:*

১১) শাশ্বত ত্রিপুরা : শতবার্ষিকী সংকলন, পৃ: ১৪৪

১২) পিনাকপাণি গুপ্ত : সঙ্গীতাচার্য পুলিন চন্দ্র দেববর্মণ স্মৃতির সরণি বেয়ে, ২০০৭, পৃ:১৫-১৬

১৩) ওই : পৃ:১৭

১৪) ওই : পৃ:১৮

১৫) ওই : পৃ:১৯

১৬) শিউলি দেববর্মা : আলাউদ্দীন সঙ্গীত সভায়, পূর্বমেঘ, নবপর্যায় প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর-নভেম্বর, ২০১২, সম্পাদক- রামেশ্বর ভট্টাচার্য, শ্যামল বৈদ্য, মনিকা দাস, পৃ: ১৩১-১৩২

১৭) ওই : পৃ:১৩১

১৮) পিনাকপাণি গুপ্ত : সঙ্গীতাচার্য পুলিন চন্দ্র দেববর্মণ স্মৃতির সরণি বেয়ে, ২০০৭, পৃ: ১৮

১৯) ড. পদ্মিনী চক্রবর্তী : ত্রিপুরায় মণিপুরী নৃত্যচর্চা, মূর্ছনা, সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক সংখ্যা, শচীন দেববর্মণ সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, ২০১৪, পৃ: ১৬

২০) শ্যামল চক্রবর্তী : শতবর্ষে শচীন দেববর্মণ

(পুণর্মূদ্রণ : অন্তর্মুখ, বাংলা গবেষণা পত্রিকা, পর্ব ৫, সংখ্যা ১, ত্রৈমাসিক, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫, বিষয়- ত্রিপুরা সাহিত্য,সম্পাদক - খোকন কুমার বাগ, এই সংখ্যার অতিথি সম্পাদক — অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়।)

ত্রিপুরার উপজাতিদের বাদ্যযন্ত্র

মৃণাল রায়

ত্রিপুরার উপজাতিদের সংস্কৃতি বিকাশের জন্য আদিম যুগ থেকে নানাহ নৃত্য বা গীতের সঙ্গে নানাহ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে আসছে। তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলি নিজেদের হাতে বানানো যেমন— বাঁশ, কাঠ, লোহা এবং নানাহ পশুর চামড়া দিয়ে তৈরী। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাদ্যযন্ত্রগুলি যেমন— সুমুই, সারিন্দা, চংপ্রেং, ডাংডু, খাম, লেবাং বা লেবাংতি এবং ওয়াখপ বা ওয়াথপ।

উপরিউক্ত প্রচলিত যন্ত্রগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল—

সুমুই ঃ এইটি ত্রিপুরার উপজাতিদের খুব জনপ্রিয় যন্ত্র। এই যন্ত্র বাঁশ দিয়ে তৈরী। সুমুই সাধারণত দুই ধরনের হয়। একটি সুমুই এ সাতটি ছিদ্র থাকে এবং অন্যটিতে আটটি ছিদ্র থাকে। সাধারনত এক ফুট থেকে দেড় ফুট লম্বা মাপের সুমুই দেখতে হয়। ইহা মুখের সাহায্যে ফু দিয়ে বাজানো হয়। জুম, লেবাং, গড়িয়া, বিজু, মগ, রিয়াং ইত্যাদি নৃত্যের সঙ্গে সুমুই যন্ত্র বাজানো হয়।

সারিন্দা ঃ এই যন্ত্র সাধারণত কাঠ বা বাঁশ দিয়ে তৈরী করা হয়। তার মধ্যে চেম্বার থাকে। চেম্বারের মধ্যে আবার চামড়া দিয়ে আবৃত্ত থাকে। যন্ত্র সাধরণত দেড় থেকে দুই ফুট লম্বা হয়। এই যন্ত্র নেপাল ও পাস্কিস্তানেও খুব ব্যবহৃত হয়। সারিন্দার মধ্যে তার লাগানো থাকে। তারের মধ্যে ছট দিয়ে ঘষে সুমধুর শব্দ বের করা হয়। ছট গুলি সাধারণত ঘোড়ার লোম দিয়ে তৈরী করা হয়। রিয়াং নৃত্যের সঙ্গে সারিন্দা বাজানো হয় এখন সাধারণত নানাহ উপজাতি নৃত্যের গীতের সঙ্গে সারিন্দা বাজানো হয়।

চংপ্রেং ঃ এই যন্ত্র কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয়। তার মধ্যে চামড়া দ্বারা আবৃতথাকে। উপরে নীচে তিনটি তার দিয়ে টানা থাকে। তারের মধ্যে থেকে সুমধুর শব্দ বের করা হয়।

লেবাং বা লেবাংতি ঃ এই বাঁশ দ্বারা নির্মিত নানাহ গীত বা নৃত্যের সঙ্গে বিট বা ছন্দ রাখার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। আমরা যেমন হাতে তালি দিয়ে নানাহ গীত,

বাদ্য বা নৃত্যের বিট বা ছন্দ রাখি, লেবাং যন্ত্রের মাধ্যমে তা করা হয়ে থাকে। শক্ত কাঠি দিয়ে ঠক ঠক শব্দ করে তা বাজানো হয়। তাতে লেবাং পোকা শব্দে উড়ে যায়।

খাম ঃ খাম সাধারণত ত্রিপুরার উপজাতির নৃত্যের সঙ্গে বাজানো হয়ে থাকে। ত্রিপুরার বিশেষ করে ১৯টি জনগোষ্ঠীতে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। খাম সাধারণত নীম, জাম, কাঁঠাল গাছের টুকরা দিয়ে তৈরী করা হয়। ইহা লম্বা ২০ থেকে ২৮ ইঞ্চি হয়ে থাকে এবং গোলাকার সাইজ নিতে হয় ১০ থেকে ১২ ইঞ্চি। এই গাছের টুকরাকে ভিতর দিকে খালি করে দুই দিকে চামড়া দ্বারা আবৃত করা হয়। তারপর ডান ও বাম দিক থেকে দেয়ালী বা দড়ি দিয়ে বেঁধে টানা রাখা হয়। এই দোয়ালী বা দড়ির মধ্যে রিং দিয়ে খামের সুর বাধা হয়, খামকে সাধারণত দুই হাতে বাজানো যায়। আবার কখনো কখনো খামকে একটি মোটা কাঠের টুকরা দিয়ে অথবা ছোট ছোট ভারী বাঁশের দুটি টুকরা দিয়ে খামের ছোট ও বড় মুখে বাজানো হয়ে থাকে। খামের বড় দিক বা বায়ার দিকের বোল বা বর্ণ গুলি হল— গি, গিত, গা, ক, গাগান ইত্যাদি এবং ছোট মুখ ডাহিনার দিকের বর্ণ গুলি হল— চন, চুন, না, চু ইত্যাদি ত্রিপুরার উপজাতি নৃত্যের মধ্যে গড়িয়া, লেবাং, মামিতা, হজাগিরি, তাংবিটি ইত্যাদি নৃত্যের সঙ্গে খাম ব্যবহৃত হয়। নিম্নে মামিতা নৃত্যের একটি বোল দেখানো হল—.

গনকি চুগান গিনে চন/

গনকি চুগান গিনে চন/

জুম বা তাংবিতি নৃত্যে তালের বোল—

মূল ঠেকা বা সম — গাগান গাগান গাগান চন/

গড়িয়া নৃত্যে তালের বোল—

গাগান গাগান গাগান গাগান/

গাগান গাগান গাগান গাগান/

উপরিউক্ত ছন্দ বাজতে থাকলে নৃত্য শিল্পীরা এসে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং নৃত্য পরিবেশন/প্রদর্শণ করার জন্য প্রস্তুত হবে। তারপর নৃত্যের দ্বিতীয় ধাপে যাবার জন্য খাম বাদ্য যন্ত্রে আবার সম দেখানো হবে।

মূল ঠেকা বা সম — চুনা গানাগান চুগান গান /

চুনা গানাগান চুগান গান /

তারপর ছন্দের পরিবর্তনে খাম বাজবে—

১। চুনা গানাগান চুনা গান /

চুনা গানাগান চুনা গান /

২। গাগান গাগান গাগান গাং/

গিনে গিনে গিনে চং /

৩। গান গানিগান গিচান নে/

গান গানিগান গিচান নে/

৪। গান চৌগান গিচান নে/

গান চৌগান গিচান নে/ ইত্যাদি

উপরিউক্ত বিভিন্ন বোল বাজানোর পর প্রত্যেকটির সঙ্গে মূল ঠেকা বা সম—

চুনা গানাগান চুগান গান /

চুনা গানাগান চুগান গান / বাজানো হয়ে থাকবে।

ওয়াখপ বা ওয়াথপ ঃ এই যন্ত্রটি বাঁশ দিয়ে বানানো হয়ে থাকে। একটি বোম বাঁশের টুকরা নিয়ে বাঁশেরি উপরের গাট ফেলে দিয়ে নিচের গাট রেখে মধ্যেখানে সমান সমান ভাবে এক তৃতীয়াংশ কেটে বাঁশটি ফাঁক করা হয়। এই টুকুরা বাঁশ দুটিকে দুই হাতে ধরে, বাজালে সুমধুর ঠক ঠক শব্দ হয়। এই সুমধুর শব্দে গানের বা নাচের ছন্দ ঠিক রাখা হয়।

ডাংডু ঃ যন্ত্রটি লোহা দ্বারা নির্মিত। দেখতে ছোট ত্রিশুলের মত লম্বায় সাধারণত দুই থেকে তিন ইঞ্চি। এই ত্রিশুলের মধ্যে ফাঁকা থাকে তাতে তার লাগানো থাকে। ঠোট ও জিহ্বার সাহায্যে বাজালে পোপাং পেপাং শব্দ বের হয়। আবার কেউ কেউ বলে থাকে যন্ত্রটি দেখতে মেয়েদের চুলের ক্লিপের মত। ত্রিপুরার উপজাতিদের গান বা নাচের সঙ্গে এই যন্ত্রটি খুব প্রসিদ্ধ।

তুমি রবে নীরবে
(নৃত্য শিল্পী ৺রমা চক্রবর্তী স্মরণে)

সংহিতা ঘোষ

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগের কথা। আমাদের এই শ্যামলা ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার বনমালীপুর এলাকার একজন স্বসনামধন্যা নৃত্যশিল্পী ছিলেন যার নাম 'রমা চক্রবর্তী'। যাকে আমি রমাদি বলে ডাকতাম। রমাদি ছিল আমার মেজদির বান্ধবী। এই সুবাদে রমাদির সঙ্গে আমার পরিচয়। তারপর পরিচয় হলোনাচের দিক থেকে। সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে তখন ভারতখণ্ডে কোর্সে রমাদি ছিল প্রথম ব্যাচের ছাত্রী আর আমি ছিলাম তৃতীয় ব্যাচের ছাত্রী। দুজনেই ভরতনাট্টম শিখতাম। আমাদের নৃত্যগুরু ছিলেন ডঃ পদ্মিনী চক্রবর্তী।

রমাদির জন্ম ২৩-০১-১৯৬৫ সালে। দিদিরা ছিল দুই ভাই দুই বোন। দিদি তুলসিবতী স্কুলে লেখাপড়া করতো। রমাদির চোখগুলি ছিল হরিনের মত। সবসময় যেন চোখে কথা বলত। গায়ের রং ছিল ফর্সা। চুলগুলি ছিল কোকড়ানো। সবসময় দু-বেনুনি করে থাকত। তার সাজ ছিল রুচিশীল। এই প্রজন্মের শিল্পীরা অনেকেই ওর নাম জানে না। কিন্তু আজ যদি রমাদি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতো তবে সে ত্রিপুরার একজন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী হয়ে থাকতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অকালেই ওকে এই ধরণী ছেড়ে চলে যেতে হলো।

আমার মনে পড়ে সেই দিনগুলির কথা। ত্রিপুরা রাজ্যে যত compitition হতো রমাদি প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতো সবসময়। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সাজে রমাদিকে আমরা দেখেছি। প্রতিটি নৃত্যেই আমরা দিদিকে নতুন নতুন রূপে দেখতে পেতাম। আর ভাবতাম আগের সাজটা থেকে এই সাজে রমাদিকে দেখতে আরো বেশি সুন্দর লাগছে। আমার জীবনের প্রথম compitition আমি দিদিকে বলেছি "তুমি এত নাচ কর আমাকে একটা নাচ তুলে দেবে? আমিও এবার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহর করবো।" তখন দিদি বলেছে "আমার একটা প্রিয় গান আছে, এটা আমি তোকে তুলে দেবো।" গানটা ছিল 'আমার যাবার সময় হলো দাও বিদায়' কিন্তু এটা আর করা হয়নি। পড়ে নজরুল গীতি

'অঞ্জলী লহো মোর সঙ্গীতে' এই গানের সাথে আমাকে একটা নাচ তুলে দিয়েছে। আমিও দিদির সম্মান রক্ষা করে দ্বিতীয় পুরস্কার এনেছি।

দিদি জীবনে কখনো হার মানেনি। কিন্তু একটা জায়গায় ওকে হার মানাতে বাধ্য করেছে। কথায় সবাই বলে মেয়েরা যদি বাবার মত দেখতে হয় তাহলে ভাগ্য খুব ভাল হয়। কিন্তু দিদির বেলায় সম্পূর্ণ উল্টো। দিদি বাড়িতে সবার খুব আদরের ছিল। দিদি দেখতে একদম বাবার মত। তোর নৃত্যগুরুও সব নাচেই রমাকে নিতেন। ও ছাড়া কোন নাচই সম্পূর্ণ হতো না। চারিদিকে শুধু রমা রমা নামটাই শুনতাম। একবার মহুয়া নৃত্যনাট্যতে রমাদি পালন-সই এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। রমাদি চলে যাওয়ার পর এই আভিনয়টা আমি করেছিলাম। সত্যি মঞ্চে আমার চোখ দিয়ে এমুনি করেই জল গড়িয়ে পড়ছিল। অনেক কষ্ট করেই আমি নিজেকে সামলে নিয়েছি। দিদির নিজের পছন্দের বিয়ে। ওর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা ওর গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। যতদিন হাসপাতালে ছিল শুধুই হাতগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নৃত্যের মুদ্রা করে কেবল বলত 'আমি আবার কবে নাচব, আমি নাচতে চাই। আমার খুব নাচতে ইচ্ছে করে।' যদিও দিদির মনের ইচ্ছেটাকে পূরণ করছেওর খুড়তুতো ভাই শুভঙ্কর চক্রবর্তী। ছোটবেলায় ওকে জোর করে এনে নাচ শিখাতো দিদি। দিদির জীবনের একটা বড় দুঃখ ছিল "নাচ করেছি অনেক কিন্তু শাস্ত্রীয় নৃত্য করতে পারিনি।" শুভকে বলেগেছিল। "তুই ভাল করে নাচবি তোর মধ্যেই আমি বেচে থাকবো।" শুভঙ্কর অবশ্য রমাদির মনের আশাটাকে পূরণ করার চেষ্টা করছে। ২২-০৭-১৯৮৭ তারিখ রমাদি আমাদের সবাইকে ছেড়ে চির বিদায় নিল এই পৃথিবী থেকে, আমাদের মন থেকে নয়। আমাদের মনের মনিকোঠায় বাসাবেঁধে চির সাথী হয়ে থাকবে তুমি। রমাদি-রমাদি- রমাদি।

"তুমি চিরদিন আমাদের কাছে আছ এবং থাকবে। "ভিতরে ও বাহিরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে"।

ঃ রবিঠাকুরের গানে রাগ সঙ্গীতের প্রভাব ঃ

অর্জুন চক্রবর্তী

"আর্টের প্রধান আনন্দ বৈরাগেৎ আনন্দ, তা ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ
হর্ষশোক থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। সঙ্গীতে সেই মুক্তির
রূপ দেখা গেছে ভৈরোঁতে, তোড়ীতে, কল্যাণে কানাড়ায়।"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাঙ্গিতীক জীবন গঠনে পোষণে ও বিকাশে একদিকে পারিবারিক আবহাওয়া, তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ও দাদা দিজেন্দ্রনাথের প্রেরণা ও উৎসাহ এবং অপরদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অভিভাবকত্ব বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। তার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অভিভাবকত্বের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার প্রেরণার মূল উৎসগুলির সঙ্গে পরিচিত না হলে সমগ্র রবীন্দ্রসঙ্গীত- সৃষ্টির ধারা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল শিক্ষা-নুবেশি করেছিলেন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধিনে, অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে এবং ভিন্ন উদ্দেশ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের কথায়—

" এক সময় পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতি দাদা নূতন নূতন সুর তৈরী করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলির নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই শব্দজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানুবেশি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।"

আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাঁহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল— অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।"

তাঁর লেখা থেকে আমরা আরো জানতে পারি এই যে, তিনি তাঁর সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের শাসনে বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে আনমনাভাবে ব্রহ্ম সঙ্গীতের তালিম নেওয়ার পাশাপাশি নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন রাগরূপের শিক্ষাও গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি প্রথাগতভাবে সঙ্গীতের শিক্ষায় নিজেকে বেঁধে রাখেননি। নিজের ইচ্ছেমতো যতটুকু পেয়েছেন ঝুলি ভরতি করেছেন তাই দিয়েই।

রবীন্দ্রনাথের ভাবের উপলব্ধি ও প্রকাশ যে কত প্রয়োজনীয় বোদ্ধা ব্যক্তি মাত্রই তা স্বীকার করবেন। আমাদের প্রাচীনযুগের সঙ্গীতেরও উদ্দেশ্য ছিল তাই। মধ্যযুগে অনেক ক্ষেত্রে এ ধারণার স্খলন হয়েছে। বর্তমান কোনো কোনো সঙ্গীতাভিমান ব্যক্তি কোনো কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুর প্রচলিত কোনো বিশেষ রাগরূপের সঙ্গে মেলে না দেখে বিভ্রান্ত বোধ করেন। তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলা যায় যে,- রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সম্পূর্ণভাবে রাগ সঙ্গীতের অঙ্গীভূত বিষয় হিসেবে বিচার করা যেমন সঙ্গত নয় তেমনই আবার সম্পূর্ণভাবে রাগ সঙ্গীত থেকে বিচ্ছিন্ন বিষয় হিসাবে বিচার করাও তেমনি সঙ্গত নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত রাগসঙ্গীতের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে জানতে হলে কবির কিছু উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন—

" ভারতবর্ষের বহুযুগের সৃষ্টি করা যে সঙ্গীতের মহাদেশ তাকে অস্বীকার করলে দাঁড়াব কোথায়? পশ্চিম মহাদেশেও বাসযোগ্য স্থান নিশ্চিত আছে, কিন্তু সেখানে ভাড়াটে বাড়ির ভাড়া জোগাব কোথা থেকে? বাংলাদেশে আমার নামে অনেক প্রবাদ প্রচলিত; তারই অন্তর্গত একটি জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্থানী গান জানিনে, বুঝিনে। আমার আদিযুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুব পদ্ধতির রাগরাগিনীর সাক্ষী দল অতি বিশুদ্ধ প্রমান-সহ দুর ভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বার্কবিতণ্ডার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সঙ্গীতকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনে; সেই সঙ্গীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি এই কথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সঙ্গীত জানে না।..

বাংলা- দেশে সঙ্গীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ। কিন্তু এই রূপকে সর্ব্বদা প্রাণবান করে রাখতে হলে হিন্দুস্থানী উৎসধারার সঙ্গে তার যোগ রাখা চাই..."

উপরে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকে এই কথাটি স্পষ্ট যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে রাগসঙ্গীতের সম্পর্কটি অতীব ঘনিষ্ঠ এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুশীলনের জন্য রাগসঙ্গীতের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি।

ভারতবর্ষে সঙ্গীত ইতিহাসে রবীন্দ্রসঙ্গীত এক বিরাট ও বিস্ময়কর অধ্যায় তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈচিত্রের বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত কঠিন। তবু চেষ্টা করছি কবির গানে 'রাগসঙ্গীতের প্রভাব' এই বিষয়টিকে যথাযথভাবে উত্থাপন করতে। সেই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রসৃষ্ট গানের শ্রেণীভেদ আবশ্যক। তবে কবির গানের শ্রেণীভেদে যাওয়ার আগে রাগসঙ্গীতের উপরে তাঁর ভাবাবেগ পরিস্ফুটনের জন্য কিছু উক্তির উল্লেখ করব—

*** " যতবার পদ্মার উপর বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘমল্লারে একটা নতুন বর্ষার গান রচনা করি..."**

*** " সংসারের ভিতরকার যে চিরস্থায়ী সুগভীর দুঃখটি , ভৈরবী রাগিনীতে সেইটিকে একেবারে বিগলিত করে বের করে নিয়ে আসে।"**

***" যদি সব সময়েই এক -একটা রাগিনীর ভিতর দিয়ে সমস্ত জগৎ দেখা যেত, তাহলে বেশ হত।"**

*** " আমাদের পূরবীতে কিম্বা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হাহাধ্বনি যেন ব্যক্তি করছে, কারও ঘরের কথা নয়।"**

*** " মনে করুন, পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যা মনে আসে আর ভৈরোঁতেই বা কেন প্রভাব কাল মনে আসে? পূরবীতেও কোমল সুরে র বাহুল্য, ভৈঁরোতেও কোমল সুরের বাহুল্য তবে উভয়েতে বিভিন্ন কাল উৎপন্ন করে কেন? তাহা কি কেবলমাত্র প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়? তাহা নহে। তাহার গূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথম প্রভাতের রাগিনী ও সন্ধ্যার রাগিনী উভয়েতেই কোমল সুরের আবশ্যক। প্রভাত যেমন অতি ধীরে ধীরে, অতি ক্রমশঃ নয়ন উন্মীলিত করে, সন্ধ্যা তেমনি অতি ধীরে ধীরে অতি ক্রমশঃ নয়ন নিমীলিত করে। অতএব কোমল সুরগুলির, অর্থাৎ যে সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, যে সুরগুলি অতি ধীরে ধীরে অতি অলক্ষিত ভাবে পরস্পর পরস্পরের**

উপর মিলাইয়া যায়, সন্ধ্যা ও প্রভাতের রাগিনীতে সেই সুরের অধিক আবশ্যক। তবে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কি কি বিষয়ে প্রভেদ থাকা উচিত? না, একটাতে সুরের ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বিকাশ, আর একটাতে অতি ধীরে ধীরে নিমীলন হইয়া আসা আবশ্যক। ভৈঁরোতে ও পূরবীতে সেই বিভিন্নতা রক্ষিত হইয়াছে সেইজন্যই প্রভাত ও সন্ধ্যা উক্ত দুই রাগিনীতে মূর্তমান।"

গানের শ্রেণীভেদ ঃ

আমাদের সঙ্গীতে গানের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বিভাগ বহু পূর্বকাল থেকে চলে আসছে। সহস্র শাখাযুক্ত সামবেদে সামগানের বহুল বর্ণনাদি আছে। সামগানের পরে ছন্দগান সমাজে প্রচার লাভ করে। সামগান গায়ককে সামগ এবং ছন্দগান গায়ককে ছন্দোগ বলা হত। ছন্দোগ গানের পরে প্রবন্ধ গান সমাজে প্রচলিত হয়। তাছাড়া অন্যান্য গীতশ্রেণী ছিল। শার্ঙ্গদেব তাঁর বিখ্যাত 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থে পাঁচ প্রকার গীতের উল্লেখ করেছেন, যথা- শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা ও সাধারণী। শুদ্ধা গীতিতে সরস ও শ্রুতিমধুর স্বরের প্রয়োগ হত। ভিন্না গীতিতে বক্র স্বর ও সূক্ষ্ম শ্রুতিমধুর গমক প্রয়োগ হত। গৌড়ী গীতিতে স্বর তিন- সপ্তক- ব্যাপী এবং পাশাপাশি স্বরে গমক-যুক্ত ছিল। বেসরা গীতিতে স্বর কেবলমাত্র দ্রুত গতিতে ব্যবহার করা হত। সাধারণী গীতি উক্ত চার প্রকার গীতির মিশ্রণে গঠিত ছিল যদিও বর্তমানে আমরা ধ্রুবপদের সঙ্গে পরিচিত। এই ধ্রুবপদ প্রবন্ধ গানেরই অন্যরূপ, এবং ধ্রুবপদকে প্রবন্ধ গানেরই প্রকারভেদ বলা চলে।

(ধ্রুবপদ) ধ্রুপদাঙ্গ ঃ

ধ্রুবপদ শব্দের অর্থ অচঞ্চল পদ অর্থাৎ যে পদ স্থির তাকে ধ্রুবপদ বলা হয়। ধ্রুপদ, ধ্রুবপদ শব্দের অপভ্রংশ, বর্তমানে ধ্রুপদের চারটি গায়ন রীতি প্রচলিত যথা - গোবর হার বাণী (গৌড়ী, খাণ্ডার, ননী ডাগুর (ডাগর) ও নওহার বাণী। গৌড়ীবাণীর বিশেষত্ব হচ্ছে প্রসাদ গুণ। এই বাণী শান্তরস উদ্দীপক, এর গতি ধীর। বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্যের প্রকাশি খাণ্ডার বাণীর বিশেষত্ব, এই বাণী তীব্ররস উদ্দীপক, এর গতি খুব বিলম্বিত লয়। ডাগর বাণীর প্রধান গুণ হচ্ছে সারল্য ও লালিত্য। এর গতি সহজ ও সরল। নওহার বাণী বলতে সিংহের গতি বোঝায়। এক সুর থেকে দুই তিনটি সুর লঙ্ঘন করে যাওয়ার এর লক্ষন। এই বাণী

আশ্চর্যের উদ্দীপক। আমরা যাকে শুদ্ধ বাণী বলি তা গৌড়ী ও ডাগর বাণীরই নামান্তর। শুদ্ধ বাণী সঙ্গীতের আত্মা। সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠাই যে শুদ্ধবাণীতে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শার্ঙ্গদেব কর্তৃক উল্লিখিত শুদ্ধা গীতির সঙ্গে অনেকাংশে তুলনীয় বর্তমান যুগের শুদ্ধবাণী যা গৌড়ীবাণী বা ডাগর বাণীরই মিলিত নামান্তর, যা প্রসাদগুণ, ধীরগতি এবং সহজ সরল মাধুর্যপূর্ণ স্বরবিন্যাসযুক্ত। এই শুদ্ধবাণীরই প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ গানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় ধ্রুপদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাঁর বহু উক্তিকে তা প্রমাণিত। একটি উক্তির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল—

" আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি - একদিকে তার বিপুল গভীরতা আর একদিকে তার আত্ম দমন, সুর-সংগীতের মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা এই ধ্রুপদের সৃষ্টি আগেকার চেয়ে আরো বিস্তীর্ণ হোক, আরো বহুকক্ষবিশিষ্ট হোক, তার ভিত্তিসীমার মধ্যে বৈচিত্র্য ঘটুক, তাহলে সঙ্গীতে আমাদের প্রতিভা বিশ্বজয়ী হবে।"

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধ্রুবপদ গানের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তাঁর গানগুলিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা প্রয়োজন, যথা— ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত ও ধ্রুপদাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য রবীন্দ্রসঙ্গীত। রাগ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ধ্রুপদ পরিবেশনের যেসব নিয়ম ও রীতি আছে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সেগুলি হুবহু এক নয়, যদিও মৌলিক বিষয়গুলি যেমন সুর, তাল ইত্যাদি সমান ঐতিহ্যপূর্ণ।

ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত- সুর রচনা বা সুর যোজনার দিক থেকে বিচার করলে ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতে দুটি শ্রেণী দেখা যায়— হিন্দিগান- ভাঙ্গা ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং স্বাধীনভাবে সুর যোজিত ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত। এর মধ্যে হিন্দিগান - ভাঙ্গা ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ হুবহু হিন্দিগানকে অনুকরণ করেননি। ঐসব গানে তাঁর কতগুলি মৌলিক বিশেষত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ ইত্যাদি লয়ের কৌশল দেখানোর রীতি নেই। লয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শব্দের যে ভাঙ্গচুর হয় এবং সেই সঙ্গে উচ্চারনের দ্রুততা ও অস্পষ্টতার জন্য ব্যাকরণ ধ্বনি বৈশিষ্ট্য যেরূপে ব্যবহৃত হয় তা রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। রাগ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ধ্রুপদে অতীত, অনাগত আড় ইত্যাদি ছন্দোবৈশিষ্ট্য দেখানো হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ গানে সেই রূপ করার রীতি নেই, কারণ তা রবীন্দ্রনাথের গানের গীতিরূপকে খর্ব করে। রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে ধ্রুপদ গানের বিষয়বস্তু সাধারণ ভগবত বিষয়, প্রকৃতি-বন্দনা, রাগ-বন্দনা ও রাগ -বর্ণনা এই কটিতেই সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায় কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতে দুটি পর্যায়ের মধ্যে অধিকাংশ ধ্রুপদাঙ্গ গান পূজা পর্যায়ের অন্তর্গত। সে তুলনায় অন্যান্য পর্যায়ভুক্ত ধ্রুপদাঙ্গ গানের সংখ্যা খুবই অল্প।

রাগ সঙ্গীতের ধ্রুপদে যে যে তাল ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে চৌতাল, সুরফাঁক তাল, ঝাঁপতাল, তেওরা, আড়া চৌতাল, বিলম্বিত ত্রিতাল ইত্যাদি ধ্রুপদ ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর গানেও ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ গানগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য রাগসঙ্গীতে ধ্রুপদের তালগুলি প্রামাণিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিভিন্ন পর্যায়ে যে গানগুলির সন্ধান মেলে তার কয়েকটি নিম্নরূপ—

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন(বড়হংসসারং/চৌতাল)

অমৃতের সাগরে (কামোদ/ধামার)

শূন্য হাতে ফিরি হে (কাফী/ সুরফাঁকতাল)। ইত্যাদি।...

খেয়ালাঙ্গ ঃ ভারতবর্ষে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ধ্রুপদ গানের যেমন বিশেষ ঐতিহ্য ধারাবাহিকতা ও মাহাত্ম্য আছে খেয়াল গানে তেমন নেই।

সামাজিক বিবর্তনের ফলে দিল্লীর দরবার ভেঙ্গে যাওয়ায় ক্রমশ সঙ্গীতকলাকারগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ছড়িয়ে পড়েন। কালক্রমে যেসব স্থানে প্রধানতঃ খেয়াল এক একটি গায়ন পদ্ধতি বা ঘরানা গড়ে ওঠে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অলংকরণ বাহুল্য ও অনাবশ্যক তানকর্তবের প্রচলন হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র সঙ্গীত সৃষ্টিতে অলংকরণ বাহুল্য ও তাঁর খেয়ালাঙ্গ গানে অনাবশ্যক তানকর্তব কোনো কালেই প্রয়োগ করেননি। খেয়ালাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতে

কেন যে বোলতান যোগ করে গাওয়া হয় না তার কারণ বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত চিন্তা সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক—

" আমার মনে যে সুর জমে ছিল, সে সুর যখন প্রকাশিত হতে চাইল তখন কথার সঙ্গে গলাগলি করে সে দেখা দিল। ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সঙ্গীতের রূপ সে রচনা করলে না, সঙ্গীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, কোন্‌টা বড়ো কোন্‌টা ছোট বোঝা গেল না।

" আকাশের মেঘের মধ্যে বাষ্পাকারে যে জলের সঞ্চয় হয়, বিশুদ্ধ জলধারা বর্ষণেই তার প্রকাশ। গাছের ভিতর যে রস গোপনে সঞ্চিত হতে থাকে, তার প্রকাশ পাতার সঙ্গে ফুলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। সংগীতেরও এই রকম দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সংগীত আকারে, আর হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে..."

এই উক্তি স্বরণে না রাখলে খেয়ালাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত তানের প্রয়োজ কেন হয় না সেই সম্বন্ধে ধারণা সঠিকভাবে গড়ে উঠবে না।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাব-রূপ আছে, বাহ্যিক তান-প্রয়োগের ফলে এই ভাব-রূপের সূক্ষ্মতা ও মনত্ব নষ্ট হয়ে যায়। তাই রাগ বিস্তারের সাহায্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবপ্রকাশের প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। ভাবপ্রকাশের জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে রচয়িতা নিজেই গানের সুরের কাঠামোর মধ্যে তান ব্যবহার করেছেন।

আঁখি জল মুছাইলে জননী (রামকেলি/ত্রিতাল)

এ কি করুণা করুণাময় (বাহার/ আড়াঠেকা)

মোরে বারে বারে ফিরালে (নটমল্লার/একতাল)। ইত্যাদি...

টপ্পাঙ্গ ঃ ভারতবর্ষে রাগ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে টপ্পাগান ধ্রুপদ ও খেয়ালের তুলনায় অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের উদ্ভাবনা। টপ্পা মূলত ঃ পাঞ্জাব প্রাদেশে উদ্ভূত। বিভিন্ন সঙ্গীত গ্রন্থে পাওয়া যায়, পাঞ্জাবের উট চালকদের বিশেষ গীত- রীতি থেকে টপ্পার উদ্ভাবনা। এই সঙ্গে সোরীর নাম গৌরবার্থে যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে গোলাম নবী এই বিশিষ্ট্য গীতরূপের প্রবর্তন করেন এবং

সম্ভবত ঃ তাঁর স্ত্রী সোরীর নামে তা প্রচলন করেন— যেজন্য উক্ত গীতরীতি সোরী মিঞার টপ্পা নামে পরিচিত হয়। পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত বলে টপ্পা গানের উদ্ভাবনা যে পাঞ্জাবে একথা প্রমাণিত হয়। ধ্রুপদ ও খেয়াল শ্রেণীর গান অপেক্ষা টপ্পা লঘুভাবাপন্ন এবং সাধারণত খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, কাফী, সিন্ধু, ভৈরবী, পিলু, মাঝ, লুম ইত্যাদি রাগের হালকা প্রয়োগে পরিবেশিত হয়।

বাংলার স্বাভাবিক লালিত্যের গুণে নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত) শ্রীধর কথক প্রমুখ সঙ্গীত রচয়িতাগণ বাংলা টপ্পা গানকে বিশেষ একটি সরস রূপ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার প্রচলিত টপ্পার একজন বিশেষ রাগগ্রাহী ছিলেন। শ্রীধর কথক রচিত একটি গান রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ আকর্ষণ করেছিল এবং তিনি সেই একটি গানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কয়েকটি গান রচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথের টপ্পা গানের প্রভাব অতীব ব্যাপক এবং টপ্পার অলংকরণের বাহুল্য ও অনেক। এখন অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে যার অংশ বিশেষে টপ্পার অলংকরণ অল্পাধিক ব্যবহৃত হয়েছে। যার মধ্যে কিছু গানকে ঠিক টপ্পা অঙ্গের বলা চলে না। এই রকম গান ছাড়া টপ্পা অঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীতকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় - ১। পাঞ্জাবী টপ্পা- ভাঙ্গা রবীন্দ্রসঙ্গীত ও ২। স্বাধীনভাবে সুর- যোজিত টপ্পাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত।

পাঞ্জাবী টপ্পা- ভাঙ্গা রবীন্দ্রসঙ্গীত

এ পরবাসে রবে কে (সিন্ধু / মধ্যমান)
পিপাসা হায় নাহি মিটিল (ভৈরবী /ত্রিতাল)। ইত্যাদি...

স্বাধীনভাবে সুর- যোজিত টপ্পাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না (বেহাগ/ত্রিতাল)
সার্থক জনম আমার (ভৈরবী/একতাল)। ইত্যাদি...

প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্রনাথের টপ্পাঙ্গ গানে জমজমাট অলংকরণের প্রাবল্য বা সুরের সামান্য হেরফেরের জন্য একই কথা পুনরাবৃত্তির আধিক্য নেই, যা কিনা রাগ সঙ্গীতে প্রবল মাত্রায় থাকার জন্য টপ্পাগানে অল্প কঠিনাত্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এখানেই রবীন্দ্রনাথের টপ্পা

গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রাগাশ্রয়ী রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলীতে সংকলিত গানগুলি, কীর্তনাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত, বাউলাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত, আনুষ্ঠানিক রবীন্দ্রসঙ্গীত, স্বদেশী রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বতন্ত্রভাবে স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল।

পরিশেষে এই কথা বলা যায় যে, সু-প্রাচীনকাল থেকে ভারতের সঙ্গীতের ধারা প্রবাহমান। এই ধারা কখনও প্রবল হয়েছে, কখনও হয়েছে ক্ষীণ। কিন্তু কখনওই তা শুষ্ক হয়ে যায় নি। ভারতীয় সঙ্গীতের ধারার মৌলিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সূক্ষ্ম যোগাযোগ আছে তা আমরা জানি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রচিত সুবিশাল এই গানের ধারাকে সবিশেষ রূপে জানতে এইটুকু আলোচনা যথেষ্ট নয় । রবীন্দ্রনাথের গানের ধারাকে বুঝতে গেলে তাঁর সামগ্রিক কর্মধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ পুরাতনকে সঙ্গে নিয়ে নতুনের হাত ধরে যে উদ্ভাসিত আলোকে আমাদের পথ চলতে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, তাঁকে সঙ্গী করে এবং তাঁর সুর সৃষ্টির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এই প্রসঙ্গটির ইতি টানছি। তাঁর বিচিত্র সম্ভার শুধু আমাদের ঐশ্বর্য নয়, আমাদের পর্ব। ভারতের সঙ্গীত ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

—ঃ তথ্য সহায়তায় ঃ—

রবীন্দ্রসঙ্গীত - প্রসঙ্গ (প্রথম খণ্ড) - শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস

রবীন্দ্রসঙ্গীত- প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড)- শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস

সঙ্গীত চিন্তা- - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এবং

* রবীন্দ্র চিন্তক- শ্রীমতী সুতপা চক্রবর্তী।

Cultural Criticism: An Analysis of Media Reporting in the context of Indian Classical Music

Dr. Tripti Watwe

It is a well known fact that Indian Culture is as diverse as its people. The varied hues of language, cuisine, customs, traditions, religions, faiths and beliefs make India a vibrant nation. India is equally well-known world over for its rich and sumptuous Classical music, which has been representing India since time immemorial within and without the boundaries of our motherland.

With the technological advancements in communication and multi-media, Indian Classical music has succeeded to reach the remotest corner of the globe. Newspapers ,magazines , websites and blogs publish all kinds of articles on Indian Classical music facilitating an aspirant to get well-versed in the nuances of this genre of music. Those who are unable to attend the concerts held in their respective cities have the facility to go through the reviews published in the next day's newspapers. These reviews either makes them envy the listeners or pat their own shoulders on their decisions of not attending the concert the day before! Whatever be the case, the purpose of this paper is to prove the hypothesis that these reviews may or may not be the proper source of acquiring information about the artist or his art form. To ponder over the reasons

that give birth to such 'coloumnistic' criticism and the consequences it begets on a national cultural heritage is the sole purpose of this paper.

Music: A long travelled Journey

Music, as a matter of fact is a social art form. From the religious doors it slowly sneaked into the common man's doorstep. To say the least, that which used to be a discipline of devotion in times of yore has now gradually turned into a hard core profession. The professionalism in music has brought both positive and negative influences along with it. Today in these times of fierce competition and bloated technology, it is nearly next to impossible that every individual gets his or her share of the limelight and give a mind-blowing recital or a presentation. Those who are adept and qualified but may not have stage presentation-guts try their hand at reporting. In some cases these reporting and reviews hit the bull's eye and give proper knowledge regarding an artist but in majority of cases, a layman in music too tries giving a review of a wholesome classical music. These laymen are generally hired by established dailies and magazine proprietors to cover up news regarding cultural scenario of any city on a minimum cost! As expected a layman comments on a professional artist knowing nothing about the art.

Elite examples

In this sequence it may be interesting to mention a few names and their outlook towards the critics. "Ustad Ali Akbar Khan and Ustad Amir Khan used to unfailingly read the critical analysis of their concerts but they used to neither remember nor gave any importance to such comments. It had only a few hours impact on them after which they again used to

delve deep into their own music and its practice because for them nothing was much significant than their music." [1]

Another interesting critic-artist duo was that of Pt. Ravi Shanker and well-known critic of New Delhi Mr. Jitendra Pratap. Pt. Ravi Shanker read comments very minutely and even used to retort back in case any critic found fault with his performance. Pt. Ravi Shanker had this complain that Mr. Pratap never praised his performances and it was also true but the amusing part is that both were students of Ustad Allaudin Khan Saheb.

On the other hand Pt. Mallikarjun Mansoor of the prestine Jaipur Gharana never used to take the reviews very seriously and addressed such untrained critics as '*kood*' meaning dirt.

Whatever be the case, to look at the whole performer-critic scenario from a distance is quite educative. To completely negate the relevance of critics is indeed uncalled for as an art form equally needs audience and connoisseur who can just appreciate and give valuable inputs for a healthy development of an art form. The critics or the reviewers belong to such a class. But today it is generally observed that critics or reviewers are not qualified enough to review or comment on a certain performance. Such untrained and unqualified critics prove to be lethal for upcoming artists as the latter's career falls prey to such comments many a times completely shattering the image before the general public.

The Philosophy behind Criticism

Nindak Niyare Rakhiye angan kuti chabay, binu pani binu sabana nirmal kare suhay

Majority of us have grown up listening to such profound verses by the famous Rahim Khankhana mirroring the true values of life. The above

mentioned line means that one should always have critics and critical people around because such people subtly sanitize our mind and soul without using any kind of gross cleaners.

We may have read these lines superficially in our childhood but as life proceeds through the thick and thin, we gradually realize the depth of these words.

As for any other discipline, these lines equally hold true for *Sangit sadhakas* as well who wish to dedicate their lives for the pious cause of music. If perceived as a subject of '*sadhana*' or worship, a sincere music seeker will always wish to have critics around him or her. But when music becomes the sole possession of a 'professional', that is where the tug of war starts!

I may take this opportunity to quote an excerpt from my compiled book 'New Dimensions of Indian Music'. It has been cited by the renowned musicologist Pt. Vijay Shanker Mishra, he says, 'Both the performers and music-critics are like the two poles of music, who together govern and maintain the equilibrium in the world of music...in my opinion to out rightly deny the importance of critics is not only an injustice on the part of the artists but it's also an act of immense stupidity. It also demonstrates the ignorance because while doing this we dishonor an entire generation of music critics and scholars. Can we ever forget or negate the relevance of writers and critics like Bharat, Sharangdeva, Matang, Dattil, Bhatkhande, Paluskar, Thakur Jaydev Singh, Prem Lata Sharma etc and many other writers like these who granted a scientific foundation to music?.. " [2]

Need of the times: A Healthy Criticism

The increased struggles have ripped off many ugly facts of the musical scenario. Lack of thoughtful organizers and sponsorers, insensible media and raw talents altogether put forth a very bitter combination. An overtly untrained critic makes things more deadly all the way ruining the cultural heritage of a nation.

So what next? Are we to shun these critics for the lack of their required qualification or promote sponsored reviewing as is practiced by many artists? The answer lies in our own bosoms. The want of quick fame encourages sponsored criticism which is no less unethical than a fixed cricket match! Therefore, recognizing the true worth of the genuine critics we must discourage untrained criticism which is being promoted by many news dailies and magazines. As an artist devotes time and energy in practicing his art form, an individual wishing to be a sincere critic must too devote his time and energy in a good, worthwhile, unbiased research of the facts before penning down a single word for or against an artist since his every word can make or mar the image of an artist.

Cool Conclusions

Last but not the least I would like to conclude with the following beautiful lines:

"*Khushboo ko phailne ka bahut shauk hai magar...mumkin nahi hawaoon se rishta kiye bagair...*" (Fragrance wants to spread far and wide but it is impossible without maintaining a good relation with the winds.)

Therefore a critic can definitely with his or her caliber of keen observation and investigation spread the fragrance of an artist's talent. An impartial and unbiased all-over analysis is surely an added qualification. On the other hand a true artist also judges the comments given by critics through his or her discretion keeping a positive approach all the way.

(Footnotes)

1. New Dimensions of Indian Music, Watwe Dr. Tripti, Kanishka Publishers, New Delhi, 2013, Pg 188

2. New Dimensions of Indian Music, Watwe Dr. Tripti, Kanishka Publishers, New Delhi, 2013, Pg 190

RABINDRANATH TAGORE AND THE CULTURES OF THE EAST AND THE WEST - A MUSICAL PERSPECTIVE

SHOUNAK RAY

After the battle of Plassey in 1757, Calcutta became a hotspot for the British to live in. With the British, came their culture which greatly influenced the lifestyle of the Bengali society. Towards the end of the 18th century and the beginning of the 19th the Bengalis of Calcutta got a first hand experience of a totally different culture - the Western culture which was open heartedly welcomed and western music, dance, theatre and various other forms of western art were learnt and rendered with a lot of interest. With the passage of time, the culture of the west gradually synthesized with its counterpart of the east. The result of which was the introduction of orchestration to Indian music with various Indian and Western instruments, formulation of Bengali notation system, publication of music books containing Indian songs set to Western staff notation, extensive use of various types of European musical instruments along with vocals in *jaatra* and theatre of Bengal, composition of Bengali song dramas in the line of European Opera and an array of other things. As a contemporary cultural personality, *Gurudev* Rabindranath Tagore was much at its receiving end.

The musicians of that period were mostly patronized by the rich *zamindar* families of Bengal -*Jorasanko Thakurbari* of Calcutta was no exception to this. The musical atmosphere in *Jorasanko*

Thakurbari was a perfectly blended mixture of the cultures of the East and the West. Rabindranath's grandfather Prince Dwarakanath Tagore appreciated and promoted the true essence of western music and acted as a source of inspiration for his next generation to work with European music. Gurudev's father Maharshi Debendranath Tagore who was at the centre stage of Bramhosamaj {"Society of Brahma," also translated as "Society of God") composed songs which were mostly based on Indian Classical music .But it was during his time that the use of accordion- an western musical instrument- was introduced in the Bramhosamaj to accompany *bramhosangeet(songs* written for the Bramhosamaj), However, it was only for a short span as its use stopped with the beginning of the era of the harmonium. This trend where the music of west complemented its eastern part passed on to Debendranath's next generation where almost all his sons and daughters including Gurudev learnt various forms of western and eastern music and enriched their musical creation by incorporating characteristics of these two different forms of music and thereby bringing these two diverse cultures closer to each other.

Gurudev's early training in music was deeply influenced by the Bishnupur Gharana. He grew up listening to, learning and absorbing the *dhrupad* and *khayal* renditions from stalwarts like Bishnu Chakraborty, Jadu Bhatta, Radhika Prasad Goswami and others. Simultaneously, he got acquainted with European music through his siblings who played piano and various other western instruments. His musical journey began by setting lyrics to the piano tunes of one of his elder brothers - Jyotirindranath Tagore who composed many tunes on the piano in the line of European music but based on Indian ragas. Rabindranath Tagore

first visited England in 1878 for studies. During his one year and five months stay there, he heard a lot of western music on different occasions and also took vocal training. In his words-"At seventeen, when I first came to Europe, I came to know it intimately, but even before that time I had heard European music in our own household." Rabindranath Tagore's musical thinking as a young man was strongly influenced by western philosopher Herbert Spencer's views expressed in his essay 'The Origin and Function of Music'. So it is clearly evident that both eastern and western culture strongly influenced Gurudev's musical journey as it took its course.

The impact of these two cultures on Gurudev is distinctly visible in his musical creations. On the one hand there are songs which Gurudev wrote on pre-composed tunes of western and Indian Classical music. Though these melodies *(sur]* were not his original compositions, he did not copy them hlindly; instead he modified them and used them according to the emotion *(bhaav)* of the song. These types of songs are called bhanga gaan.

Some examples are:

Rabindrasangeet .-

Main song

Purano sei diner katha	*Auld Long syne (Scottish)*
Katobaro bhebechinu	*Drink to me only with thine eyes (English)*
Joyo tobo hichitro anondo	*Jaya prabala begabati (Dhrupad)*
Mondire momo ke	*Sundara lagori hain(Khayal)*

and many others.

On the other hand many of his musical creations are a fusion of characteristics of both these two cultures. His first such musical creation was 'Valmiki *Pratibha'*, the first of his three song dramas. In 1870s

professional theatre groups in Bengal started their journey under the pioneership of Girish Ghosh, Amritlal Basil and a group of other young dramatists who were strongly influenced by Opera and other plays of Western professional theatre groups. They set up a professional theatre group 'National Theatre' which in 1879 staged a Bengali song drama composed as an exact replica of European opera. Shantidev Ghosh - the noted Rabindrasngeet scholar and performer - feels that this was an important event in the history of Bengali drama as it was a first of its kind and it made the path easier for Gurudev to compose his first song drama *'Valmiki Pratibha'*. On *'Valmiki Pratibha'* Gurudev in his autobiography *Jeevansinriti* commented that it was a new experiment in the field of music and the audiences need to listen to and watch it simultaneously. According to him, it was different from European opera and was born out of the combination of western and Indian tunes. The impact of this song drama on the music and literary world was clearly felt. According to Shantidev Ghosh an idea for an overall judgement of *rabindrasangeet* can be drawn on the basis of his musical thinking that evolved out of the combination of Indian and western tunes in *'Valmiki Pratibha'*. Tagore's other two song dramas - *'Kaalmhgaya'* and *'Mayor Khela*- are also a combination of influence of these two cultures. This influence is not only limited to Tagore's song dramas, many of his songs bear some basic characteristics of these two forms of music. Chorus - a part of song which is repeated after each verse - is a characteristic of western music. In some songs of Tagore this chorus part can be clearly distinguished. The most prominent example being our national anthem -*janaganamana adhinayaka jaya he* where *jaya he jaya he* is the chorus part.

On comparing western and Indian classical music, Tagore in a

conversation with the great scientist Einstein in August 1930, expressed his opinion that the freedom of rhythm and time in European music is more as compared to Indian music. But in India the singers have a lot of freedom regarding the melody part which is in scarce in the western music. Tagore felt that in India, this freedom of variations in melody to the singer often overshadows the original composition of the composer. Tagore as a composer composed his music in such a way that it provided almost no freedom of time / rhythm (taal) and melody *(sur)*. His music reached a high level of perfection in combining *'sur'*, too/ and *'katha'* (poetry) into an inseparable new entity, which became *'sangeet'* (music).

Melody - the perceptible tune of a piece of music- and harmony - when two or more notes sound simultaneously- are two important characteristics of western music. In most western music, the harmony serves an accompaniment role to the melody, usually in the form of chords - when three or more notes sound simultaneously. Though Tagore did not harmonize his songs, nowadays harmonization in rabindrasangeet is quite common in the form of instrumentation involving western instruments like piano, guitar, etc. However, it is a debatable subject. But it should always be kept in mind that this harmonisation must not overshadow the emotion (bhaav) of the song in any way rather it should complement the melody and bhoov of the song. . Thorough understanding of various aspects of Rabindrasangeet, raag-raaginis, philosophy of Tagore is some of the basic pre-conditions to this.

From Tagore's writings and conversations with many eminent Indian and Western scholars on music, it appears he was of the view that the language of music cannot be fully universal. In a conversation with Edward Thompson, Tagore stated "It is nonsense to say that music

is a universal language." He believed that lyrics are an important part of the song and 'mere tunes cannot stand by themselves'. So lyrics need to be properly translated to enhance the acceptability of music universally. He felt that "music should be more universal than other forms of art, for its vehicle is easy to reproduce and transmit from one country to another." He advocated that through the combination of music of the West and the East, music will gradually acquire new values and ideas which will prompt people of one part of the world to easily appreciate and associate themselves with the music of the other part. This in turn will strongly bond the people in this era of degrading human values.

The Impact of Sankardeva and His Sattras on the Social life of Assamese People

Smita Lahkar

The Great Sankardeva- philosopher, educationist; poet, playwright, lyricist, painter, singer and dancer of Assam and his Sattra, the Vaishnavite monasteries, play an unavoidable role to influence the lives of Assamese people by sublimating the entire society, then ridden with religious malpractices.

Although primarily a religious reformer preaching Bhakti cult of Vaishnavism, the great Sankardeva did not confine his activities to the field of religion alone. Gifted with a rare intellectual vigor and profound vision, the saint of Assam utilized most effectively the precious moments of his life in giving new form and richness to the Assamese language besides laying the foundation of an organized and distinct form of Assamese culture and literature. Assamese as a community which was till then a mere geographical expression was endowed with a distinct identity by Sankardeva, who had the magic power to knit together the diverse and at times warring clans and communities into a composite whole. The advent of this saint can, therefore, rightly be described as the most significant event in the annals of the whole of undivided Assam marking as it did the birth of a newly inspired and united Assamese community.

Sankardeva, as a social reformer, carved for him an abiding niche of glory in the history of this sub-continent by waging a relentless

war against the blind upholders of narrow casteism and challenging the haughtiness of those who wanted to perpetuate the barriers of caste on the basis of wrong interpretation of the basic training of Hindu religion. He was single handedly responsible for creating a casteless and classless Assamese society by eradicating social evil like untouchability. He also held the banner of revolt against excessive rituals and superficial formalities of religion and domination of priestly class. He brought a new message of hope to the unlettered millions that they could also attain spiritual excellence through simple devotion and faith in one Supreme God. The compassionate saint, who saw the supreme being in all forms of life and respected the inner souls of all including even the humblest creatures like dogs and foxes did not find any justification behind the system of abhorring man only on consideration of so-called low birth. Not only did he defy and expose the hollowness of untouchability but also gave initiation to the so-called low birth as he did to those of the higher castes. Hence, Sankardeva recognized the dignity of labour of all castes and respected the profession of his followers, including the so called 'lower' caste and poor weavers, blacksmiths, oil-producers, angler, tailors etc. A democratic system in Barpeta Sattra was introduced by Mathura Das Burha Ata, who was a weaver. Chandasai, a Muslim follower, tailored the apparel of Sankardeva. This shows the importance given by the saint to each section of the society.

The greatest achievement of Sankardeva was to assimilate the both indigenous and non-indigenous into Assamese society. He preached the fundamental equality of all religions through the medium of drama, dance, songs, literature etc. as he realized the power and potential of

vocalized word integrated with the visual image for the expression and communication. So, besides reviving the monotheistic doctrine which is the quintessence of Indian religious philosophy, Sankardeva gave a new life and vigor and also a new direction to the culture of the Assamese people. With this reforming movement, Assamese life and culture still ill affords a break up even after five centuries. What Srimanta Sankardeva had done for the enrichment of Assamese art and literature, has perhaps never been done by a single individual to any single literature. Departing from the path of the orthodox scholars who had been writing only through the medium of Sanskrit, Sankardeva composed his monumental works in a language intelligible to the masses. By narrating the glory and greatness of the Almighty and expounding the abstruse philosophy of life in the medium of the common people, he flung open door of knowledge to the masses enabling the unlettered millions to drink deep into the eternal wisdom of this ancient land. As a great lyricist and a skilled musician, Sankardeva composed one hundred celestial verses known as the Borgeets of which only 34 numbers so far been traced and they form a pride of possession in the domain of Assamese devotional songs. Besides the Borgeets, the maestro composed other hymns scattered over his dramatic works and also in his Chapayas, Bhatimas or panegyrics and the Totayas composed in Totaka metre.

Sankardeva made best use of drama and theatre as an effective means of preaching the glory of God for easy comprehension of the common masses. He wrote altogether six dramas famously known as 'Ankiya Naat' or 'Bhaona'. 'Ankiya' means principal part of a drama i.e. 'act' or 'episode', and 'Nat' means drama or play. Thus, 'Ankiya Nat' means play with acts. But by 'Ankiya Nat' people here understand plays

written by great Sankardeva. It is a class by itself. Actually, the form gets its name from the nature of the productions, which are narrative, drawing from myths and legends of Hinduism, Saturated with emotions, expressed through mask, song, dance, dialogue and presented in one sitting (as one ank or continuous act). Out of this seamless presentation, the dance Sattriya has culled out. These features are reflective of how these forms moved away from the pan Indian texts of earlier centuries, which contained a Sanskritised "National culture" paradigm. It is one of the oldest dramatic forms of Assam.

The great organizer, Sankardeva did remold and consolidate the fabric of the Assamese social life by setting up Sattras and Namghars which are till now knitting together the diverse sections of the Assamese society as a composite entity. The Namghar in every village was founded to serve a variety of purposes of a prayer hall, cultural centre, library and venue of social get-together. The orderliness, unity and integrity that still mark the Assamese villages by and large are pre-eminently the results of the Namghars which may be aptly described as one of the most outstanding social institutions of India having the strength to withstand many an adverse tides and vicissitudes.

Sattras literally mean holy areas, which are socio-religious institutions in Assam. It acts as the preaching centers of Vaishnavism, popularly known as Mahapuruxiya Dharma which was propagated by the Great Sankardeva. Monks, who are full time residents of Sattras, are called "Bhakats". In some orders of the religion, the Bhakats are celibate. Though Sattras were set up to propagate Vaishnavism, it also has cultural and historical roles for the better upliftment of the society. Here itself Sankardeva created Ankiya Nat and Sattriya Dance, the eighth

and youngest classical dance of India. The dance form created by Srimanta Sankardeva in Sattras was later developed to a great extent by his principal disciple Sri Sri Madhabdeva within the Sattras, and hence it is called Sattriya Dance. In addition to dance, singing, acting and playing of instrument were also taught and learnt in the Sattras.

The Sattras were, and still are a school and a library. Every Sattra possesses a library consisting of manuscripts to the extent of a few thousand copies. Big Sattras like Auniati and Dakhinpat once contained more than a thousand manuscripts, some of which are being preserved in different antiquarian institutions like the Kamrupa Anusandhan Samiti (Assam Research Society) and the Department of Antiquarian and Historical Studies (DHAS). Some rare Sanskrit manuscripts like the Srihasta-Muktavali of Subhankar (a treatise on the hand-gestures employed in the Sattiya Dance), Satvata-tantra and the Hastividyarnava (a treatise on elephants) by Sukumar Barkath, in which the Ahom royal court has also been depicted through excellent contemporary paintings, have been recovered from the Sattra libraries of Majuli. The total number of manuscripts in Majuli is estimated to be around 4,000.

With the rise of the Sankardeva Movement, the responsibility of imparting education came under Sattra's domain. The Assamese language as a popular medium of instruction developed during the medieval period. Srimanta Sankardeva was the first person in Assam to introduce mass-education. The Sattra institution voluntarily took upon itself the noble responsibility of enlightening the people through their own educational institutions known as 'Tols'. All the important Sattras used to maintain a regular band of scholars, whose duty was to impart

education, mainly in respect of ancient lore and scriptures. Along with the Vaishnavite texts and the Vedic and Puranic lore, the other branches of study such as Vyakarana, Nyaya and Kavyas were also taken up for the study and were not neglected.

Many of the early Vaishnavite reformers took upon themselves the task of educating their pupils. Madhavadeva, the ardent disciple of Sankardeva, conducted a regular tol in the precincts of his Sattra and it is narrated in the biography by Ramaraya that 1,000 students received education from him. The medieval caritas record many instances to show that the Vaishnavite teachers were greatly responsible for diffusing knowledge among the masses.

The Sattras imparted both formal and informal education. It imparted formal education through the tols and catuspathis, maintained by some of the affluent Sattras, and informal education that was more effective than the former in the case of the masses, consisted of sermons, exposition of scriptures and discussions on philosophical and theological matters during the prayer services. In this way, the Sattras produced successful teachers and missionaries as well as eminent philosophers, scholars and poets.

The Sattras play a great role in the social life of contemporary period. It was not only a place for spiritual solace but a place to shelter the poor and the hungry. The Bhakats or monks had to earn for their living. Similarly, the Namghar set up in the villages for worship becomes the hub of socio-economic activities and arbiter of local disputes. In fact, it becomes something like what noted educationist Dr Maheswar Neog calls "Village Parliaments" run on democratic principles. The banking system of these institutions prevalent for ages is a subject of

research. The ivory works of Barpeta Sattra is another feature of Assamese culture. The preparation of traditional jewellery in Barpeta at the insistence of the reformer continues to flourish till today without any Government patronage.

Today's youth has to take lessons from these important facets of the reforms brought about for the benefit of the society. Despite potentialities, the youth are attracted to secessionist ideologies that are basically aimed at destroying the socio-fabric created such a towering.

Srîmanta Sankardeva will ever be remembered in the history of this country as one of the greatest integrators of the Indian people. Through his extensive tours and pilgrimages throughout the country and his profound study of the history and philosophy of the vast land, Sankardeva could realize the vision as well as mission of India. He also realized that in spite of the over-riding unity of India there were still local variations which could never be ignored. He, therefore, took some long term measures in order to forge a sentimental link with the rest of the country through which the common men in Assam could feel one with the vast country that is India. After forging a sense of unity among the various communities living in Assam, Sankardeva proceeded further in his mission of integrating inextricable Assamese people in the mainstream of Indian nationality.

Today when 80 crores people of India are getting more and more conscious about the basic identity of their culture and common aspirations, it is hoped that the lofty ideals of equality, compassion, love and non-violence as preached by Sankardeva would continue to inspire everyone to work for consolidation of national unity and formation

of spiritual excellence. The eternal message he left for the society about the fundamental unity pervading all human hearts should now be the guiding light for us all to lead life dedicated to the cause of national advancement in particular and brotherhood and well being of mankind as a whole.

When the entire world is unstable due to in fight for basic identity of one's culture, religion and common aspirations, the philosophy of Sankardeva and the Sattras definitely carries a ray of hope to consolidate equality, non-violence and sense of universal brotherhood.

INDIAN CULTURE

Shreyashi Das

We consider our ancient Indian heritage from our Vedic period. Ramayana and Mahabharata, these are our two upanishads about the vedantic philosophy of god.

The mystic relation of love between God and his devotee which Rabindranath gave exposition in his lyric trio - Gitanjali, Gitimalya and Gitali.

Our Indian culture is very rich. We must protect our heritage. If we see in Indian Classical music, there are number of gharanas in Hindusthani, Karnatik, Instruments came from ancient Indian culture in the period of Harrapa Sanskriti. Some popular gharanas in Indian Classical Music are -Kirana gharana, Beneras gharana, Patiala gharana, Agra gharana, Gwalior gharana, Ajrara gharana etc.

In India our Muslim culture is also very rich - Quwali is the main traditional culture among the Muslims, from our ancient period in every field, the culture has been started seriously. Our ancestors were very serious about their cultural matters.

In the ancient period, our musical culture was very developed; rishis have started music in their own away called guru shishya paramoara. At that time gurus knew the science of music. Really at that time guru shishya parampara was very respectable. Sanskrit is the subject which

sages or rishis used in their puja. Sanskrit is our oldest subject.

Great expert in the field of music - Matangmuni, Shyama Shastry, Tyagraja, they wrote their book in Sanskrit. Our proud Nalanda University in Bihar is one of the famous universities in the whole world. If we study our culture deeply, then we have many splendor heritage - India Gate, Delhi; Red Fort, Delhi; Rashtrapati Bhawan, Delhi; Bahai House of Worship, Delhi, Qutab Minar, Delhi, Humayuns Tomb, Delhi, Jantar Mantar, Delhi; Meenakshi Sundareshwar Temple, Madurai; Jewish Synagogue, Cochin; Jama Masjid, Delhi; Golden Temple, Amritsar; Tajmahal, Agra; Buland Darwaja, Fatehpur Sikri; The Bade Imambada, Lucknow; Gateway Of India, Bombay; Kailash Temple, Ellora; Goi Gumbaj, Bijapur; Se Cathedral, Velha, Goa; Basilica Of Bom Jesus, Velha, Goa; Mahabodh Temple, Bodhgaya; Victoria Memorial, Calcutta; hawa Mahal (Palace of winds) Jaipur; Sanchi Stupa, Sanchi, MP; Lingaraja Temple, Bhubaneshwar; Jagannath Temple, Puri; Surya Temple, Konark; Shatrunjaya Hill Temples, Palitana, Gujrat; Vaishnodevi, Jammu; Dilwara Temple, Mount Abu; Sun Temple, Modhera, Gujrat; Dakhineshwar Templi; Calcutta.

Basically, our country is famous for uncountable festivals. In Tagore's line- "Aanondodhara Bahicche Bhubone" the festivals are - Kullu Dusshera, Kullu; Surajkhand craft's mela; Pushkar fair, Pushkar; Garba, Gujrat; Kangra Painting, Himachal Pradesh; Kartik Purnima, Uttarkhand; Kumbh, Uttar Pradesh; Madhubani Painting, Madhubani; Saga Dawa, Arunachal Pradesh & Sikkim; Bihu, Assam; Chhat, Bihar; Shiv Ratri, Madhya Pradesh; Sarhul, Jharkhand; Durga Puja, West Bengal ; Ganesh Utsav, Maharashtra; Bastar Tribal Art, Chhatisgarh;

Yakshagana, Karnataka; Goa Carnival, Goa; Ugadi, Karnataka; Pongal, Tamil Nadu; Onam, Kerala.

As we know that dance is such type of culture people can express themselves. In previous time, dance of radha and Krishna is known as rasleela.

Rabindranath Tagore retrieves this prestigious culture as an art form. The famous dances in India are - Bharatnatyam, Kathak, kathakali, oddissi. In our country, Udayshankar was an great exponent in dance. Few traditional dances of different states art) as follows - Bhangra, Punjab; Folk Dance, Rajasthan; Kathak, Uttar Pradesh; Manipuri, Manipur; Khajurahu Dance Festival, Madhya Pradesh; Kuchipudi, Andhra Pradesh; kerala, Kathakali; Bharatnatyam, Tamil Nadu; Odissi, Orissa.

If we want to hear the sound of wave, water and air, we need Wordsworth's ear. Painting and craft is an expression as well as feeling of something. Definitely in expression, form and content are also important. Actually, craft as well as painting are related to truth, beauty and nature. Our traditional art and crafts are - Jappi, Assam; Bamboo and Cane craft, Arunachal Pradesh; Wood Vessels, Chattisgarh; Embroidery, Jammu and Kashmir; Metal Craft, Manipur; Jewellery making, Nagaland; Embroidery and weaving, Rajasthan.

After all we are proud to be Indians, we have 22 regional languages - Assamese, Bengali, Gujrati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Telgu, Urdu, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Gorkhali, Manipuri, Konkani, Bodo, Maithili, Santhali, Dogri.

Our Flag consists of three horizontal bands - Saffron, White and Dark Green with the Ashoka wheel (having 24 spokes) in a dark blue colour in the centre of the white band; all strips being equal in width. !t is rectangular in shape, the ratio of length to the breadth being 3:2. The emblem of the flag is an exact reproduction of Dharma Chakra on the capital of Ashoka Pillars at Saranath.

According to Dr. S. Radhakrishnan, the saffron colour represents the spirit of renunciation, the white stands for truth and peace, and green signifies growth.

The emblem of the Government of India is a reproduction of Ashok Pillar's at Saranathina. It shows three standing lions at a base having a Dharma Chakra in the centre, a bull on the right and a horse to the left. The word "Satyameva Jayate" means" Truth Alone Triumphs" are inscribed in devnagari at the bottom.

JAI HIND

INCREDIBLE INDIA

Faculty and Other Staff of Sachin Debbarman Memorial Govt. Music College

Department of Vocal & Instrument

1. Dr. Tripti Wathe (Astt. Prof.) Deputed
2. Sri Sidhartha Choudhury (Astt. Prof.)
3. Sri Sushanta Lodh (Instructor)
4. Smt. Chhanda Nandi (Instructor)
5. Smt Kakali Das (P.G.T)
6. Smt Sunetra Roy (P.G.T)
7. Smt Jina Debbarma (Accompanist)
8. Sri Arunabha Sharma (Accompanist)
9. Sri Sidhartha Sarkar (Accompanist)
10. Smt Garanti Debbarma (Accompanist)
11. Sri Abhijit Sharma (Guest Lecturer)
12. Sri Ratan Kumar Rakshit (Guest Lecturer)
13. Smt Mampi Deb (Guest Lecturer)
14. Smt Moumita Chakraborty (Guest Lecturer)

Department of TABLA

1. Sri Pradip Kr. Bhattacharjee (Sr. Lecturer)
2. Sri Mrinal Roy (Instructor)
3. Sri Narayan Majumder (Instructor)
4. Sri Shyamal Deb (Instructor)
5. Sri Subrata Talukdar (Instructor)
6. Sri Debasish Debnath (Accompanist)
7. Sri Jayanta Rn. Dhar (Accompanist)
8. Sri Pradip Sarkar (Accompanist)
9. Sri Pritam Debbarma (Accompanist)
10. Sri Mrinal Kanti Das (Accompanist)
11. Sri Suman Ghosh (Accompanist)

12. Sri Tapodhan Chakraborty (Accompanist)
13. Sri Arjun Chakraborty (Guest Lecturer)
14. Smt Chameli Acharjee (Guest Lecturer)

Department of Rabindra Sangeet

1. Sri Sounak Ray (Astt. Prof.)
2. Smt Sukla Bhattacherjee (P.G.T)
4. Smt Sutapa Choudhury (Accompanist)
5. Smt Mili Saha (Guest Lecturer)
6. Smt. Maurita Roy (Guest Lecturer)
7. Smt Shreyashi Das (Guest Lecturer)

Department Dance

Manipari

1. Sri Bankim Sinha (Instructor)
2. Smt Hena Sinha (Guest Lecturer)

Kathak

1. Smt. Manashi Ghosh (Instructor)
2. Sri Chinmay Das (Instructor)
3. Smt. Jyoshi Debbarma (Accompanist)
4. Smt Purnashree Ghosh (Guest Lecturer)

Bharat Natyam

1. Smt. Smita Lahkar (Astt Prof)
2. Smt Sanhita Ghosh (Instructor)
3. Smt. Mistu Deb (Guest Lecturer)

Kuchupuri

1. Smt Boby Chakraborty (Guest Lecturer)

Department of Bengali

1. Dr. Manika Das (Astt. Prof.)
2. Smt Kalpana Dey (P.G.T)

Department of English

1. Sri Amaranthus Debbarma (Guest Lecturer)

Office Staff

1. Sri Parimal Das -Head Clerk

2. Sri Jaydeep Podder - U.D.C
3. Sri Rathin Acharjee - L.D.C
4. Md. Foprman Ali - L.D.C
5. Sri Nandadulal Datta (Group-D)
6. Sri Ratan Kumar Roy (Group-D)
7. Sri Ajit Choudhury (Group-D)
8. Smt Jayanti Das Debnath (Group-D)
9. Smt Pratima Modak (Group-D)
10. Sri Amar Chandra Das (Swiping & Cleaning)
11. Sri Arun Chakraborty (Night Guard)
12. Sri Sujit Deb (Computer Operator Contigent)
13. Smt Sankari Roy (Swiping & Cleaning-Contigent)

Library

1. Sri Sandhya Debbarma (Sorter)

Computer

1. Smt Swagata Choudhury (Guest Lecturer)

celebration of
112th Birth Anniversary of
SACHIN DEBBARMAN

লহ প্রণাম
রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান

লহ প্রণাম
রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান

HAPPY TEACHERS DAY
2015

এন.এস.ডি-র পরিচালনায় নাটকের কর্মশালা

শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের
সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান
১৫, ১৬ ও ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহ
শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের
সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত
সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ■ মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহ, আগরতলা

পুলিন দেববর্মা-র শতবর্ষ উদ্‌যাপন ও অডিটরিয়াম উদ্বোধন

রক্তদান অনুষ্ঠান

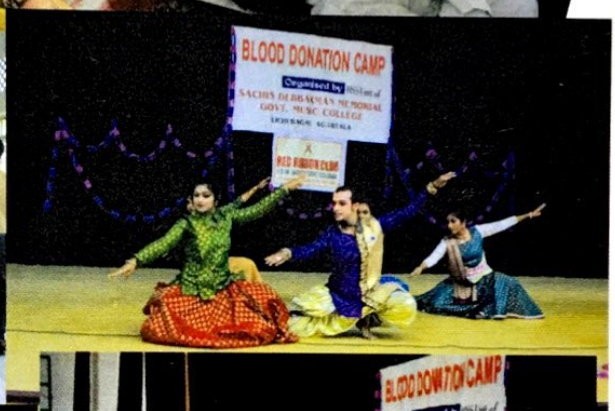

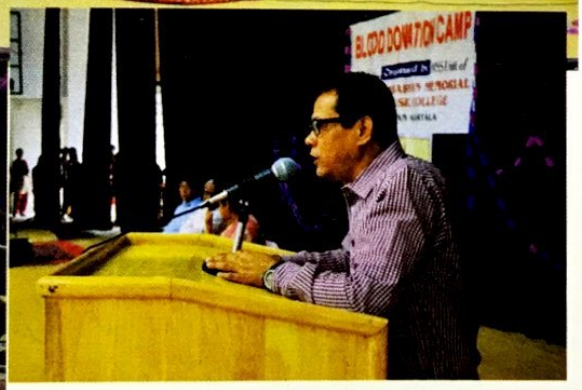

প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

শ্রদ্ধায়-স্মরণে ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক

শিল্পী মৃণাল চক্রবর্তী কে বিদায় সম্বর্ধনা

নবীন বরণ উৎসব ও বিদায় সম্বর্ধনা

ভাতখন্ডে ও পলুস্কর জন্মজয়ন্তী

স্বচ্ছ ভারত অভিযান

ಮಾನವೀಯತೆಯ ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತು

ಈಚೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಷುವಾರ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯ.

Remedial Coaching Class
WORKSHOP ON

Remedial Coaching Class
WORKSHOP ON
(FOLK SONG)
Sachin Debbarman Memorial Govt. Music College
Lichubagan, Agartala, Tripura

HAPPY
TEACHER'S

HAPPY
TEACHER'S

2014 11 06